ইসলামী শরী‘আতে শাস্তির বিধান

العقوبة في الشريعة الإسلامية

< بنغالي >

ড. আব্দুল কারীম যাইদান

অনুবাদক: মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

العقوبة فى الشريعة الإسلامية

د. عبد الكريم زيدان

ترجمة: محمد برهان الدين

مراجعة:د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

শাস্তির ভিত্তি, মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

প্রসঙ্গ কথা:

১. ইসলামী শরী‘আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে সুবিন্যস্ত করে, মানুষের সকল কাজের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করে, জীবন পরিচালনার পথ-পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বলে দেয় এবং আল্লাহর সাথে ও অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কের সীমানা নির্ধারণ করে। ফলে মানুষের কোনো কিছুই শরী‘আতের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে না।

২. ইসলামী শরী‘আতের বিধি-ব্যবস্থা মেনে চললে, তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করলে এবং তার বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য-সফলতা নিশ্চিতভাবে লাভ হবে। কেননা, সঠিক পথের সন্ধান কেবল এখানেই আছে, অন্য কোথাও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা‘আলাতা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ [النجم: ٢٣]

“অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৩]

তিনি আরও বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۖ﴾ [الانعام: ٧١]

“বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ।”[সূরা আল-আ‘আম,

আয়াত: ৭১]

সুতরাং ইসলামী শরী'আতের মূলভিত্তি কুরআনই সমগ্র মানবজাতির হিদায়াত তথা পথ নির্দেশনা দানকারী। তবে কুরআনের কতিপয় আয়াতে হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রদর্শন কেবল মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে:

﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوۡعِظَةٌ لِّلۡمُتَّقِينَ ١٣٨﴾ [ال عمران: ١٣٨]

"এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৮]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧﴾ [يونس: ٥٧]

"হে মানবকুল! তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" [সূরা ইউনূস, আয়াত: ৫৭]

এ সব আয়াতের অর্থ এ নয় যে, কুরআন কেবল মুমিনদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের জন্যই এর হিদায়াত সংরক্ষিত। বস্তুত: মুমিন-মুত্তাকীরা ছাড়া যেহেতু অন্য কেউই এর নির্দেশনা মেনে চলে না এবং এর দ্বারা উপকৃত হয় না, তাই আয়াতে শুধু তাদের হিদায়াতের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. কুরআন কারীম প্রসঙ্গে অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'যারা কুরআনের পথ নির্দেশনায় চলে কার্যত: কুরআন তাদেরকেই সে পথ

দেখিয়ে দেয়, তবে যারা এর পথ নির্দেশনায় চলে না, কুরআন তাদেরকেও পথ দেখাতে সক্ষম।’[1]

৩. ইসলামী শরী‘আতের প্রদর্শিত পথ মেনে নিতে অস্বীকার করলে, বাস্তব জীবনে এর পদ্ধতি ও নীতিমালার অনুসরণ অগ্রাহ্য করলে ও এর হুকুমের অবাধ্য হলে অস্বীকারকারী-বিপথগামীদেরকে তা নিশ্চিতরূপে দুঃখ-ভারাক্রান্ত, অসুখী জীবন ও শাস্তির দিকে ধাবিত করবে।

৪. শরী‘আতের বিধি-নিষেধের অবাধ্য ও অমান্যকারী অপরাধীদের শাস্তি দু’ধরনের:

প্রথমত: পরকালীন শাস্তি। সেদিন শাস্তির এ বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলার হাতেই ন্যাস্ত থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٖ مُّحۡضَرٗا وَمَا عَمِلَتۡ مِن سُوٓءٖ تَوَدُّ لَوۡ أَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أَمَدَۢا بَعِيدٗاۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٣٠﴾ [ال عمران: ٣٠]

“সে দিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও। সে কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান হত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সবধান করছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩০]

ইসলামী শরী‘আতে পরকালীন এ শাস্তিই আসল শাস্তি। কেননা এ শাস্তি হবে মানুষের পরীক্ষাকাল তথা পার্থিব জীবন শেষে ‘আমলনামা গুটিয়ে নেওয়ার পর। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সব ‘আমলের মূল্যায়ন করা

[1] ইগাছাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান, ইবন কায়্যিম, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৭।

হবে। এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে আল্লাহ আখিরাতে হিসেব গ্রহণ করবেন। এ কারণে আখিরাতকে বলা হয়েছে يوم الدين (প্রতিদান দিবস) তথা يوم الحساب (হিসেব গ্রহণ দিবস)। পরিশেষে সৎকর্মশীলগণ তাদের উপযুক্ত পুরস্কার পাবে এবং অপরাধী পাবে তার যথোপযুক্ত শাস্তি।

আখিরাতের এ শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচারেরই দাবী এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের অপরিহার্য পরিণতি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটি নয় এবং তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. **দ্বিতীয়ত:** পার্থিব শাস্তি। এ ধরনের শাস্তি দু প্রকারে হয়ে থাকে:

প্রথম প্রকার: আল্লাহ তা'আলার পার্থিব নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি জগতে এ শাস্তি হয়ে থাকে। এর পশ্চাতে থাকে কারণ ও তার প্রতিক্রিয়া এবং কতিপয় পটভূমির মিলিত ফলাফল। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যাত হলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির ওপর এ জাতীয় শাস্তি নেমে আসে। এর ধরণ হয় বিভিন্ন রকম। কখনও গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, কখনও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও মতভেদ সৃষ্টি করে শত্রুজাতির পরাধীন করে দেওয়া হয়, কখনও তাদের ওপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কষ্টকর জীবন চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা দারিদ্রতা, ভয়ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং জনসংখ্যা ও ফসল-ফলাদির উৎপাদন হ্রাস করে দেওয়া হয় কিংবা অন্য কোনো শাস্তির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে আল্লাহর স্থায়ী নীতির অধীনে এ ধরনের শাস্তির ইঙ্গিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিম্নে উদ্বৃত করা হলো:

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۝٢٣﴾ [الفتح: ٢٣]

"তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম। তুমি আমার নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম পাবে না।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৭৭]

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝١٣٧﴾ [ال عمران: ١٣٧]

"তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর, অতঃপর লক্ষ কর মিথ্যারোপকারীদের শেষ পরিণতি কীরূপ ছিল।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৭]

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَٰفِرِينَ أَمْثَٰلُهَا ۝١٠﴾ [محمد: ١٠]

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করে নি এবং দেখে নি, তাদের পূর্ববর্তীদেরপরিণাম কীরূপ হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিদেরকে জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।" [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১০]

আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তাঁর নীতির কোনো বদল বা পরিবর্তন হয় না। ধ্বংসই তাদের অনিবার্য পরিণতি। এটা আল্লাহর সেই শাস্তি, যা কারণ, কারণের প্রতিক্রিয়া ও সমন্বিত পটভূমির ফলাফল হিসেবে কোনো জনগোষ্ঠির ওপর তাঁর স্থায়ী নীতির ভিত্তিতে কার্যকর হয়। এ নিয়ম লঙ্ঘন হওয়া বা বাতিল হওয়া অসম্ভব। তবে ভিন্ন কোনো কারণ থাকলে পরিণতি বিলম্বে হতে পারে।

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾﴾ [الكهف: ٥٩]

“ঐসব জনপদের অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালংঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমরা স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৯]

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ۚ﴾ [النمل: ٥٢]

“এই তো ওদের ঘরবাড়ি -সীমালংঘনের কারণে যা জনশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে।” [সূরা আন-নামল: :৫২]

দেখা যাচ্ছে জন সমষ্টির মধ্যে যুলুমের প্রসার হওয়া তাদের ধ্বংসের কারণ। আর ধ্বংস হওয়া পার্থিব শাস্তিসমূহের মধ্যে একপ্রকার শাস্তি, যা আল্লাহর অনুসৃত নীতির অন্তর্ভুক্ত।

গ. আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ۚ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

﴿وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْۖ﴾ [الانفال: ٤٦]

“তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে সাহস হারাবে এবং তোমাদরে শক্তি বিলুপ্ত হবে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

এখানে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, হীনবল হওয়া ও শক্তিহীন হওয়া পারস্পরিক বিবাদ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়ার পরিণতি।

অনুরূপ দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানের ওপর ঐক্যবদ্ধভাবে অটল না থাকার পরিণতি শাস্তির দিকে ধাবিত করে। হাদীসে আছে,

«الجماعة رحمة والفرقة عذاب».

“ঐক্য রহমত আর অনৈক্য আযাব।”

ঘ. আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

মানুষ যখন আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে যায় তখন বস্তুগত বা অবস্তুগত বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন প্রকারের জীবনোপকরণের সংকীর্ণতা -ব্যক্তি ও সমষ্টিকে গ্রাস করে ফেলে।

ঙ. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে, তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণির লোক চুরি করলে ছেড়ে দেওয়া হতো আর নিম্ন শ্রেণির লোক চুরি করলে শাস্তি দেওয়া হতো।” এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শাস্তিদানে পক্ষপাতিত্ব করা এবং আইনকে সমতার সাথে কর্যকর না করা তাদের ধ্বংসের কারণ।

৬. এ জাতীয় শাস্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচ্য থাকে। যথা:

ক. কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যে যখন এ জাতীয় শাস্তির কারণ বিরাজমান থাকে এবং সে কারণে তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসে তখন সৎ-অসৎ সবাই তাতে নিপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢٥﴾ [الانفال: ٢٥]

"আর তোমরা এমন ফিৎনা থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষত: শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে যালিম এবং যেনে রেখো, আল্লাহর 'আযাব অত্যন্ত কঠোর।" [সূরা আল-আনফাল :২৫]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب.

"আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনগণ যেন তাদের সমাজে অন্যায়ের প্রশ্রয় না দেয়। দিলে সবাই শাস্তির আওতায় পড়বে।[2]

সৎ লোকদের ওপর শাস্তি আসার দু'রকম ব্যাখ্যা করা যায়:

এক -এ শাস্তিকে রোগের পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে। রোগ যখন মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সুস্থ্য লোক তাতে আক্রান্ত হয়।

দুই -যে কারণে শাস্তি এসেছে সে কারণ প্রতিহত করতে সৎ লোকদের চেষ্টার ত্রুটি থাকা। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ নেই।

---

[2] তাফসীর কুরতুবী: ৭ম খণ্ড, প্র. ৩৯১।

খ. দুনিয়ার এ প্রকারের শাস্তির কারণে অভিযুক্তরা আখিরাতের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না যদিও তারা দুনিয়ার শাস্তি ভোগ করে থাকে। আখিরাতের শাস্তি পাওনা সত্ত্বেও দুনিয়ায় তাদের শাস্তি ভোগ আল্লাহর চিরন্তন বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীদের জন্য তা শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ﴾ [يوسف: ١١١]

"তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১১১]

৭. **দ্বিতীয় প্রকার:** সেসব পার্থিব শাস্তি এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে এবং শাসকগণকে তা কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছে। যারা শরী'আতের বিধান লংঘন করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত বা অবশ্য করণীয় কাজ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সে কাজগুলো শরী'আতে অপরাধ হিসেবে গণ্য তাতে যারা লিপ্ত হয় তারা এ শাস্তির আওতাভুক্ত। যেমন চুরির ক্ষেত্রে চোরের হাত কর্তন এবং ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি। এই শ্রেণির শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য -এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। চারটি পরিচ্ছেদে আমরা এ আলোচনা শেষ করবো। প্রথম পরিচ্ছেদে শাস্তির উৎস ও ভিত্তি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাস্তির সাধারণ নীতিমালা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাস্তির বৈশিষ্ট্য এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে শাস্তির প্রকারভেদ।

৮. এ জাতীয় শাস্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচ্য থাকে। যথা:

ক. দুনিয়ার এ শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি আখিরাতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে না। কেননা আখিরাতের শাস্তি মওকূফ হয় তওবায়ে নাসূহা দ্বারা;

দুনিয়ার শাস্তি দ্বারা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٌ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৩-৩৪]

হাদীসে আছে:

«إن السارق إذا تاب سبقت يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقت يده إلى النار».

“চোর তওবা করলে তার হাত জান্নাতের দিকে অগ্রসর হয়, আর তাওবা না করলে অগ্রসর হয় জাহান্নামের দিকে।” এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, চুরির দায়ে দুনিয়ার শাস্তি হিসেবে হাত কাটা গেলেও সে আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। তবে হাঁ, তওবায়ে নাসূহা করলে ভিন্ন কথা।

খ. শাস্তির এ বিধান জারি করার উদ্দেশ্য ইসলামী শরী'আতের বিরোধিতার পথ বন্ধ করা। এ বিরোধিতা স্বয়ং মুসলিমদের পক্ষ থেকেও হতে পারে।

কেননা মানুষের সৃষ্টি উপাদানে সীমালংঘন ও অন্যায় যুলুম করার প্রবণতা নিহিত আছে। এই প্রবণতার মূলোৎপাটন করার লক্ষ্যে দুনিয়ায় শাস্তির বিধান রাখা একান্তই জরুরী, যাতে ঝোকবশতঃ এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যায়।

গ. শাস্তির এ বিধান ইসলামী শরী'আতের ব্যাপকতারই প্রমাণ, যা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমনটি আগে বলা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: শরী'আতে শাস্তির ভিত্তি

৯. ভিত্তি বলতে এখানে সেই ভিত্তির কথা বলা হয়েছে যার ওপর শরী'আতের শাস্তির বিধান বা শাস্তির দর্শন প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ঐ মূল ভিত্তি যার ওপর দণ্ড নির্ভর করে। অন্য কথায়, যার ওপর গোটা ইসলামী শরী'আত দাঁড়িয়ে আছে। কেননা দণ্ড ও শাস্তি পূর্ণাঙ্গ শরী'আতের একটি অংশ ও দিক মাত্র। আর ইসলামী শরী'আত যেমন সকল দিককে পরিবেষ্টন করে তেমনি এর সকল অংশকে সুবিন্যস্ত করে। তাই এর এক অংশের সাথে অন্য অংশের কোনো অমিল বা বিরোধ নেই। যেহেতু এর সকল অংশ এক মহান উদ্দেশ্য সাধনে সদা তৎপর তাই এর জন্য মহান ও একক ভিত্তি থাকাও জরুরী। কী সেই ভিত্তি? নিম্নের আয়াতে আমরা তার সন্ধান পাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧﴾ [الانبياء: ١٠٧]

"আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭]

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, শরী'আত বা ইসলামী বিধান, যার মধ্যে দণ্ড বা শাস্তি অন্যতম এর ভিত্তি হলো রহমত বা দয়া। অর্থাৎ বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া। তিনি মহা-মহীম, রহমানুর রাহীম-দয়ার সাগর। সব কিছুকেই তাঁর দয়া পরিবেষ্টন করে আছে। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রহমান নামে অভিহিত করা যায় না। বলা বাহুল্য, অপরাধীর শাস্তি বিধান যেহেতু শরী'আতেরই একটি অংশ। তাই এ শাস্তিও বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও দয়া হিসেবে গণ্য।

১০. রহমত বা দয়ার অপরিহার্য দাবি-মানুষের জন্য যা মঙ্গল ও কল্যাণ তা

তাকে প্রদান করা এবং যা ক্ষতি ও অকল্যাণ তা তাদের থেকে দূর করা। রহমতের এ দাবি এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ শরী'আতে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীছের বর্ণনা সে দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বহু সংখ্যক আলেম তাদের অভিজ্ঞান দ্বারা এ নিগুঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ ফকীহ ইয ইবন আব্দুস সালাম রহ. বলেন,

إن الشريعة كلها مصالح أما درء مفاسد أو جلب مصالح.

"ইসলামী বিধান পুরোটাই কল্যাণময়। এর দ্বারা এক দিকে অশান্তি দূর হয়, অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"[3]

ইমামকূল শিরোমনি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

"ইসলামী শরী'আতের আগমন হয়েছে শান্তি দান ও তার পূর্ণতা সাধনে এবং অশান্তি বিলোপ ও তার মূলোৎপাটন ঘটাতে।"[4]

মহান ফকীহ ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكم كلها.

"শরী'আতের ভিত্তি রচিত হয়েছে বান্দার ইহ ও পরলৌকিক কল্যাণ বিবেচনায় অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে। এর পুরোটাই ইনসাফ ও রহমতে পূর্ণ,

---

[3] ইয ইবন আবদুস সালাম, কাওয়াইদুল আহকাম, পৃ-৫।

[4] ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩১।

পুরোটাই কল্যাণ ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ।”[5]

১১. যখন সাব্যস্ত হলো যে, রহমতের দাবী মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা প্রদান করা এবং যা ক্ষতিকর তা দূর করা, তখন অনায়াসে এ কথাও বলা যায় যে, শরী‘আতের ভিত্তি বা দর্শনও (যার মধ্যে শাস্তির বিধানও অন্তর্ভুক্ত) মানুষের জন্য যা হিতকর তার ব্যবস্থা করা এবং যা ক্ষাতিকর তা দূরিভূত করা।

১২. মানব জাতির কল্যাণ কিসে নিহিত তা কেবল শরী‘আতে ইসলামীয়া থেকেই জানা সম্ভব। অর্থাৎ ইসলামী শরী‘আতই হচ্ছে কল্যাণের তুলাদণ্ড। সুতরাং শরী‘আত যাকে কল্যাণ ও উপকারী বলে সাক্ষ্য দেয় সেটা অকাট্যরূপে মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং যাকে ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করে সেটা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ক্ষতিকর। এ মানদণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা ও আপন খেয়াল-খুশী মতো চলা। এটা একান্তই ভুল ও বাতিল পথ, যা কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]

“হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি তোমার লোকদের মধ্যে ন্যায়-নীতি দ্বারা শাসন কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।” [সূরা সদ, আয়াত: ২৬]

[5] ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ৩য় খণ্ড, পৃ-২।

হক বা ন্যায়নীতি হলো সে পথ যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। পথ মাত্র দুটো - সত্য পথ ও প্রবৃত্তির কামনার পথ। সত্য পথ, যেটা আল্লাহ তার বান্দার জন্য নির্ধারণ করেছেন। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই প্রবৃত্তির কামনা। প্রবৃত্তির পথ হচ্ছে ভুল ও বাতিল। এ পথে রয়েছে মানুষের জন্য শুধুই ক্ষতি ও দুর্ভোগ। সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত ও আপন বান্দাগণের জন্য নির্ধারিত পথের অনুসরণ এবং এর বাইরের সকল পথ পরিহার করার মধ্যেই রয়েছে মানবতার আসল কল্যাণ।

১৩. মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ পাঁচটি জিনিস হিফাজত করার মধ্যে নিহিত,। সেগুলি হলো -দীন, জীবন, বিবেক, বংশধারা ও সম্পদ। বিজ্ঞ আলেমগণ এগুলোকে কল্যাণের মৌলিক স্তর হিসেবে গণ্য করেন। এগুলো সংরক্ষণ ও লালন করার ব্যাপারে সকল জাতি একমত। কেননা এগুলো বিলুপ্ত হলে মানব সভ্যতার চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। এগুলো শেষ হয়ে গেলে মানব জীবন আর টিকে থাকতে পারে না। তাই ইসলামী শরী'আতে এগুলোর বিলোপ সাধন বা সীমালঙ্ঘন করাকে হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম গাযালী রহ. তাই এ পাঁচটি বিষয়ের হিফাজত সম্পর্কে বলেন,

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة... ثم قال: وتحريم تفويت هذه الأمور الخمسة والزجر عنه يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق: ولذا لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر.

“এ পাঁচটি মৌলিক বিষয় সংরক্ষণ করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তাই হলো –কল্যাণ। আর যেসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা এগুলোর বিলুপ্তি ঘটে তাই হলো অকল্যাণ। এরপর তিনি বলেন, মানব কল্যাণে রচিত সকল জাতির সকল

বিধানে এ পাঁচটি বিষয় ক্ষুন্ন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। তাই কোনো শরী'আতেই কুফর, হত্যা, ব্যাভিচার, চুরি ও মাদক হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতোবিরোধ নেই।"

১৪. ব্যক্তির বুনিয়াদি সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী শরী'আত মানুষের এ মৌলিক কল্যাণসমূহ সংরক্ষণ করে তার মনজিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে। ইসলাম ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষকে তার ভিতর থেকে সংশোধন শুরু করে। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতির ভিত্তিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, ধ্যান-খেয়ালে তাঁকে স্মরণ রাখা ও ভয় করা শেখায়। তিনি সর্বক্ষণ (জ্ঞানে, পর্যবেক্ষণে ও শক্তিতে) তার সঙ্গে আছেন এ অনুভূতি তার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। ফলে সে সর্বদা উপলব্ধি করতে থাকে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ যে সব কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে -কোনো মানুষ না জানলেও তিনি তা জানেন। আল্লাহ তার কার্যাবলী সংরক্ষণ করছেন এবং কিয়ামতের দিন এর ভিত্তিতে বিচার করবেন। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা থেকে যখন সে রেহাই পাচ্ছে না, তখন দুনিয়ার শাস্তি ও মানুষের বিচার থেকে ছাড়া পেলেও বা তার লাভ কী? ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে এ সংশোধনী দ্বারা বান্দার আত্মিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি লাভ হয়। সে আর কেবল আল্লাহকে ভয় করার স্তরে আটকে থাকে না; বরং সহসা এ স্তর অতিক্রম করে যায় অথবা ভালোবাসার স্তরের সাথে যুক্ত হয়। ফলে সে দ্রুত আল্লাহর আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাঁর কোনো হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ প্রেমিকের অবস্থা তো এ রকমই হয় যে, সে তার প্রেমাস্পদের আনুগত্য করবে, কোনো ব্যাপারেই তার অবাধ্য হবে না এবং যা সে পছন্দ করে দ্রুত সে দিকে এগিয়ে যাবে। সন্দেহ নেই, ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে

গৃহীত ব্যক্তি পর্যায়ের এ প্রশিক্ষণ অচিরেই তার মধ্যে ভালো কাজের প্রতি অনুরাগ ও মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করবে এবং শরী'আতের বিরোধিতা করা ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। ব্যক্তি ও সমষ্টির মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য এটিই হচ্ছে নিশ্চিত ও মোক্ষম ব্যবস্থা। উপরন্তু ব্যক্তির সংশোধন ছাড়া ইসলামী শরী'আত সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, সমাজ পবিত্র করা এবং সমাজ থেকে অশান্তি ও বিপর্যয় দূর করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে এসে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কার্যকর হয়। এটা অনস্বীকার্য যে, একটা পবিত্র সমাজ ব্যক্তি পর্যায়ে সংশোধনী কার্যাবলীর পূর্ণতা বিধানে বিশাল অবদান রাখে। সেই সাথে সমাজে কোনো অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় এবং তার ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির শান্তি বিঘ্নিত না হয় সে দিকে কড়া নজর রাখে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যক্তির অভ্যন্তরীন সংশোধন ও সমাজ সংস্কারকরণ এমন দু'টি মজবুত স্তম্ভ, যার মাধ্যমে মানব জাতির কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দমন নিশ্চিত হয়।

১৫. কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু লোকের মধ্যে দুর্বলতা থেকে যায়। ইসলামের এ সংশোধন পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে ফলদায়ক হয় না। ফলে তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অন্যের ওপর যুলুম করে ও তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করে। এ ক্ষেত্রে মানুষকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে ও ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করতে ব্যক্তি সংশোধনের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন জরুরী হয়ে পড়ে। সে উপায় হিসাবে ইসলামে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ শাস্তির ভিত্তিও সেই মূল উৎস যার ওপর গোটা ইসলামী শরী'আত প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ মানুষের প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন। শাস্তির

মধ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা থাকলেও এটা রোগীর তিক্ত ও কটু ঔষধের সাথে তুলনীয়। ঔষধের তিক্ত গুণের পিছনে উদ্দেশ্য থাকে রোগীর সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.

“শাস্তির বিধান মূলত বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত। বান্দাহর প্রতি সদয় করুণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তার দয়া থেকে এর প্রকাশ। এ জন্য যে ব্যক্তি মানুষকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয় সে যেন এর দ্বারা তাদের প্রতি ইহসান ও কল্যাণের মনোভাব পোষণ করে। যেমন সন্তানকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে পিতার উদ্দেশ্য থাকে আদব শিক্ষা দেওয়া এবং ঔষধ সেবনে ডাক্তারের উদ্দেশ্য থাকে রোগীকে আরোগ্য দান করা।”

শাফে‘ঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা মাওয়ারদী তা‘যীর (তিরষ্কার, শিক্ষামূলক শাস্তি) সম্পর্কে এক আলোচনায় বলেন, এটাও এক প্রকার দণ্ড। এটা মানুষকে সংশোধন হওয়ার ও সতর্ক থাকার শিক্ষা দেয়।[6]

মোটকথা: শাস্তির ভিত্তি হলো মানবতার কল্যাণ সাধন এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। এর দ্বারা অপরাধীকে যদিও কিছুটা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়; কিন্তু তা শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় নয়। আরো স্পষ্ট কথা এই যে, শাস্তির যন্ত্রণা মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখে। আর অপরাধ থেকে বিরত থাকলেই ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি

[6] আল আহকাম আস-সুলত্বানিয়া লিল-মাওয়ারদি, পৃ-২১৩।

বিরাজ করে। কেউ যদি অন্যায় কাজে জড়িত হয় এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে এই শাস্তি দেওয়ার মধ্যে সমাজের কল্যাণ নিহিত থাকে। কেননা এর দ্বারা সমাজে সৃষ্ট অপরাধ অপসারিত হয় এবং এর যে অংশটি নষ্ট হয়েছিল তার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। আর এটা সবার জন্য কল্যাণকর। এমনকি অপরাধী ব্যক্তির জন্যও। অপরাধীর জন্য কল্যাণ এই যে, শাস্তি ভোগের পরে তার অনুভূতিতে স্বীয় অন্যায়, পাপ ও আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার অনুতাপ উদয় হয় এবং উপদেশ-অনুরোধ কাজে না লাগাবার ত্রুটি বুঝতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পাপের উপলব্ধি ও অনুভূতি অপরাধীর অন্তরে ঈমান জাগ্রত করে দেয়। ফলে সে তওবায়ে নাসূহা করতে সমর্থ হয় এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না। অনেক পাপী ব্যক্তিকে দেখা গেছে শাস্তি ভোগের পরে পাপ করার পূর্বে সে যেমন ছিল তার চেয়েও অধিক **ভালো** হয়ে গেছে। সুতরাং শাস্তি তার জন্য কল্যাণ ও সংশোধনের সফল মাধ্যম হিসেবে গণ্য। শাস্তি ভোগের পরে যদি সে তাওবায়ে নাসূহা করতে সক্ষম না-ও হয়, তবুও অন্তত এতটুকু সাবধান ও সতর্ক হয়ে যায় যে, পুনরায় এ অপরাধ করলে প্রথমবারের মতো আবার শাস্তি ভোগ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে অন্তরে শাস্তির ভয় থাকা এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করাও তার জন্য এক প্রকার কল্যাণ এবং এটা তার প্রথম বারের শাস্তিরই সুফল। আর যদি সে এর পুনরাবৃত্তি ঘটায় তাহলে তা অন্যদেরকে সে কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং সবার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। ফলে এ ক্ষেত্রেও সামাজিক কল্যাণ সুরক্ষিত হবে।

এখানে কল্যাণের বিভিন্ন দিক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো উক্ত অপরাধী অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করলে এবং দ্বিতীয়বার শাস্তি দেওয়া হলে তার যতটুকু ক্ষতি হয় তার চেয়ে অন্যরা যে শিক্ষা পায় তার গুরুত্ব অনেক বেশী। নিয়ম

হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রে কল্যাণ ও ক্ষতি একত্রিত হয়ে গেলে বৃহত্তর কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়, যদিও তাতে ক্ষতির কিছু দিকও বিদ্যমান থাকে। এ কারণে ইসলামী শরী'আত শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আসল অপরাধী যাতে শাস্তি পায় সে ব্যাপারে বিচারককে দূরদর্শিতা অবলম্বন করতে, অনুকম্পা না দেখাতে কিংবা রহমত ও দয়ার দোহাই দিয়ে শাস্তি মওকূফ না করতে কঠিনভাবে তাকিদ দিয়েছে। রহমতের উদ্দেশ্য কেবল করুণা প্রদর্শন করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য মানব সম্প্রদায়ের উপকার ও কল্যাণ সাধন করা, যদিও সে পথটি হয় অতি তিক্ত ও বিস্বাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾ [النور: ٢]

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী -এদের প্রত্যেককে একশত করে কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে এদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মুমিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা আন-নূর: ২]

ডাক্তার যদি রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না করে এবং চিকিৎসার জন্য জন্য গরম লোহা দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়া আবশ্যক হলেও দয়া দেখিয়ে তা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এ দয়া রোগীকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিবে। তখন ডাক্তারকে রোগী ও তার পরিবারের জন্য দয়ার্দ্র না বলে বলা হবে নির্দয়-নিষ্ঠুর, চিকিৎসার কাজে চরম অবহেলাকারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শর'ঈ শাস্তির মূলনীতি

১৬. ইসলামী শরী'আতে শাস্তির ভিত্তি বান্দার প্রতি রহমত ও দয়া প্রদর্শন, তাদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের থেকে যাবতীয় অকল্যাণ দূরীকরণ। তাই এ ভিত্তি থেকে স্বাভাবিকভাবেই কতিপয় মূলনীতি বেরিয়ে আসে, ইসলামে শাস্তির বিধান প্রবর্তনে যেগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। যাতে এ ভিত্তির সাথে শাস্তির সামঞ্জস্য থাকে এবং শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়। কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের উক্তি থেকে সেসব মূলনীতি জানা যায়। বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো বিবেচনায় রাখা জরুরী। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আলোচনা করা হলো:

১৭. **প্রথম মূলনীতি:** 'অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষা।' এ মূলনীতিটি মূলত: বান্দার প্রতি আল্লাহর ন্যায় বিধানের একটি নমুনা। কারণ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে প্রয়োজনের তাকিদে। আর প্রয়োজন অনুপাতেই তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া শাস্তি সংশোধন ও মানব কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য মূল বিষয় নয়; বরং ব্যতিক্রমী বিষয়। আর যা ব্যতিক্রম তা সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী। শাস্তি হলো রোগীর ঔষধস্বরূপ। রোগের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সুক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী ঔষুধের মাত্রা ততটুকুই দিতে হয়, অনুমান করে দেওয়া যায় না। যেমন দেওয়া যায় সুস্থ্য ব্যক্তিকে তার খাদ্য। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠﴾ [الشورا: ٤٠]

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪০]

سيئة বা মন্দ বলতে তাই বুঝায় যা মানুষ অপছন্দ করে। এ হিসেবে শাস্তিও سيئة বা মন্দের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামী শরী'আতে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী। ইচ্ছাকৃত হত্যা ও জখম করার শাস্তি হিসেবে কিসাসের ক্ষেত্রে এ সমতা স্পষ্ট। তাই এসব অপরাধে কিসাসই উপযুক্ত শাস্তি। আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর অপরাধী ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে অনুরূপ আচরণ তার ওপর করাকে কিসাস বলে। অন্যান্য অপরাধের تعزير বা অনির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রেও সমতার এ নীতি বিদ্যমান। কেননা تعزير বা অনির্ধারিত শাস্তির অপরাধ বিভিন্ন রকম হওয়ায় শাস্তির (تعزير) ধরণও বিভিন্ন রকম হয়। একইভাবে হুদুদ বা নির্ধারিত দণ্ডের অপরাধ ও তার শাস্তির মধ্যে সমতা উপস্থিত। এতদসত্ত্বেও কেউ কেউ ভিন্ন কথা বলে থাকেন। তবে গভীরভাবে চিন্তা করলে এসব অপরাধ ও তার দণ্ডের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানকার সমতা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পণ্য মাপার সমতার মত ইন্দ্রিয় বা বস্তুগত নয়; বরং অপরাধের পঙ্কিলতা ও ক্ষতির পরিমাণ এবং নির্ধরিত দণ্ডের মধ্যে যে অবস্তুগত সমতা এখানে তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। শরী'আত প্রণেতা আল্লাহ নিজেই এখানে এসব অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন -যাকে হদ বা দণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং আমাদেরকে নিশ্চিত ও প্রশান্তচিত্তে মেনে নিতে হবে যে, এ জাতীয় অপরাধ ও শরী'আত নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যথাযথ সমতা বিদ্যমান আছে। সামনে দণ্ডমূলক শাস্তি প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচন করা হবে।

১৮. **দ্বিতীয় মূলনীতি:** 'নিবৃত্তি।' এ মূলনীতির উদ্দেশ্য-শাস্তির পরিমাণ এতটুকু হওয়া আবশ্যক যাতে অপরাধীর অপরাধ করার প্রবণতা নিবৃত্ত হয় এবং

সমাজের সবাই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকে। এ জাতীয় কোনো অপরাধ যদি সংঘটিত হয় তাহলে তার শাস্তি এমন হতে হবে, যেন অপরাধী উচিত শিক্ষা পায় ও একই অপরাধ পুনরায় করতে সাহস না পায় এবং অন্য কেউ অনুরূপ কাজে উদ্বুদ্ধ না হয়। শাস্তি ব্যবস্থায় এতটুকু দুঃখ-যাতনা থাকা দরকার, যাতে জনমনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং শাস্তি পাওয়ার ভয়ে অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা প্রতিটি লোকই স্বভাবগতভাবে নিজের প্রাণকে ভালোবাসে ও দুঃখ-যাতনাকে ভয় করে। সে যখন জানবে যে, এ অপরাধ করলে তার প্রাণ যাবে কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ পাবে অথবা দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হবে বা অঙ্গচ্ছেদ হবে। তখন শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত হয়ে সে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। কেউ যদি অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে এবং তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করে, তবে শাস্তির দুঃখ-বেদনা স্মরণ করে সে পুনরায় ঐ কাজ করা থেকে ক্ষান্ত থাকবে এবং অন্যরাও সংযত হবে। তাই জনৈক ফকীহ শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন, অপরাধ ঘটার পূর্বে এটা থাকে নিবৃত্তকারী আর ঘটে যাওয়ার পরে হয় সতর্ককারী।

১৯. **তৃতীয় মূলনীতি:** ‘অপরাধী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণসহ সমাজকে অপরাধের ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ।’ প্রকৃতপক্ষে এ মূলনীতিটি শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সমন্বয় করেছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হলো অপরাধীর ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে সমাজকে অপরাধের কবল থেকে সুরক্ষা করাকে গুরুত্ব দেওয়া। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ও সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তার সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে শাস্তি নির্ধারণ করা, যদিও তা সমাজের স্বার্থ রক্ষায় যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হয়। কেননা, এখানে সমাজকে অপরাধের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার গুরুত্বের

চেয়ে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ও সংশোধনের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এ দু'ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে শরী'আত শাস্তির বিধান প্রণয়নকালে উভয় প্রকারের জন্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করেছে। যাতে সমাজের স্বার্থ ও অপরাধীর কল্যাণ উভয়টা বহাল থাকে। এ বিভাজন পদ্ধতির আলোকে ইসলামী শরী'আত হদ বা নির্ধারণ দণ্ডের ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দণ্ড দানের পূর্বে অপরাধ করার সময় তার বালেগ হওয়া, জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন থাকা, ইচ্ছাকৃত করা, নিরুপায় হয়ে করেছে কি-না বা কেউ তাকে বাধ্য করেছে কি-না অথবা অজ্ঞাত বসত[7] করেছে কি-না তা বিবেচনা করার প্রতি জোর দিয়েছে। কিন্তু যদি কোনো বালেগ লোক স্বজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃতভাবে, নিরুপায় না হয়ে ও অন্যের চাপে বাধ্য না হয়ে দণ্ড জাতীয় অপরাধ করে যেমন, ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান ইত্যাদি, তাহলে সকল ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সে নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হবে। তার পরিবেশ, অবস্থান, চরিত্র, শিক্ষা-সভ্যতার মান ও মানসিক অস্থিরতার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কেননা, অপরাধের জঘন্নতা ও ভয়বহতার মোকাবেলায় তার এ সবের কোনোটিই তার প্রাপ্য শাস্তি লাঘব কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে তা বদলিয়ে দেওয়ার সমর্থন যোগ্য বলে বিবেচনা করে না। যেহেতু সে যখন এ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তখন সে প্রাপ্তবয়স্ক ও পূর্ণ বিবেকবান। স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে এবং কোনো কারণে বাধ্য না হয়ে সে এহেন কাজ করেছে। উচিত ছিল, তার

---

[7] যেমন, কেউ যদি আংগুরের জুস মদ নয় ভেবে পান করে তবে তার শাস্তি হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোনো নারী কোনো পুরুষকে জড়িয়ে ধরে এবং সে তাকে স্বীয় স্ত্রী মনে করে মিলিত হয়, তবে তার ওপরও কোনো শাস্তি আসবে না।

বিবেক এ অপরাধ করতে তাকে বাধা দিয়ে বিরত রাখবে। কিন্তু যখন সে ক্ষান্ত হলো না তখন শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। বিচারক শাস্তি কার্যকর করা ব্যতীত অন্য কিছুর অধিকার রাখে না। সমাজকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের কল্যাণ সুরক্ষার এটাই সঠিক পথ। সমাজের যাবতীয় কল্যাণ সুনিশ্চিত করা সমাজেরই দাবি। কারণ সমাজ একটি বিশাল-বিস্তৃত ঘর সদৃশ। আর জনগণ সে ঘরের বাসিন্দা। তাদের সমাজ নামক ঘরটি সকল প্রকার হুমকি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকলেই তাদের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দণ্ড কর্যকর করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় আরেক দিকে লক্ষ্য করলে। তা হচ্ছে, দণ্ডযোগ্য অপরাধীকে তার সামাজিক মর্যাদা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে প্রাপ্য দণ্ড না দিয়ে যদি বিশেষ প্রকারের লঘু শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে সমাজে ঐরূপ অপরাধ করার প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে এবং এ জাতীয় অপরাধীরা সেই শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, যা তাদেরকে অপরাধ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত। কারণ এ অবস্থায় তখন অপরাধকারীর পারিপার্শ্বিকতাকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং এ অসংবিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র শাস্তি তখন এমন একটি ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে যার কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নেই। ফলে এ প্রক্রিয়ার মধ্যে হীন মানসিকতা ও নিকৃষ্ট ভাবনা প্রবেশ করার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। পরিণামে শাস্তি নির্ধারণে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যা সমাজে বড় ধরণের অশান্তি বয়ে আনবে। অথচ শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল সমাজ থেকে অশান্তি ও অকল্যাণ দূর করা। কিন্তু এ অশান্তি দূর হবে না এ জাতীয় সকল অপরাধীর ওপর উক্ত দণ্ড কার্যকর করা ব্যতীত। অবশ্য রায় দেওয়ার পূর্বে উত্তমরূপে দেখতে

হবে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় করা, অনন্যোপায় হয়ে করা, অন্যের চাপে করা এবং অজ্ঞতাবশত: করা হয়েছে কিনা -যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

ইচ্ছাকৃত হত্যা বা আহত করার অপরাধের শাস্তি কিসাস, যদি এর শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করা যাবে না। তবে দেখতে হবে অপরাধী পূর্ণ বয়স্ক কি-না, তার বিবেক বুদ্ধি আছে কি-না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে কি-না। তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কেবল এ দিকগুলোই বিবেচনা করা হয়েছে। অবশ্য আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার ওয়ারিশগণের জন্য শরী'আত অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। তারা ক্ষমা করে দিলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। অবশ্য আদালত তখনও তাকে শিক্ষামূলক অন্য শাস্তি তা'যীর (تعزير) দেওয়ার অধিকার রাখে।

অন্যান্য অপরাধ অর্থাৎ যেসব অপরাধে লঘু শাস্তি দেওয়া হয় এবং শরী'আত কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে নি, সেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার মর্যাদা, গতি-প্রকৃতি ও পূর্বের কৃতি বিবেচনা করা আবশ্যক। কারণ, এসব অপরাধের ক্ষতির দিক হদ ও কিসাসের অপরাধের ন্যায় চরম পর্যায়ের নয়। সেজন্য এ জাতীয় অপরাধের বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শাস্তি বিবেচনা করার সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং তার সংখ্যা অনেক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী শরী'আতে শাস্তির বৈশিষ্ট্য

২০. ইসলামী শরী'আতে অপরাধের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ফকীহগণ বলেন,

إنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

“অপরাধ হলো, শরী‘আতের সে সব নিষিদ্ধ বিষয় যেগুলোর সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা হদ বা তা‘যীর দ্বারা সতর্ক করেছেন।”[৪]

শরী‘আতের নিষিদ্ধ বিষয়াদি বলতে সে সব কাজ বুঝায় যা করতে বা ছাড়তে শরী‘আত নিষেধ করেছে। এক কথায়, করণীয় কাজ না করা অথবা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার নামই অপরাধ। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কর্ম সম্পাদন কিংবা বর্জন এ দ্বিবিধ বিষয়ই অপরাধ। কেননা ইসলামী শরী‘আত একে নিষিদ্ধ বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। অনুরূপ শাস্তির উৎসও শরী‘আত। শরী‘আত বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়ে বলে দিয়েছে যে, এই অপরাধের এই শাস্তি। ইসলামী শরী‘আতে এ শাস্তি দু প্রকার:

প্রথম প্রকার: নির্ধারিত শাস্তিসমূহ, যা প্রথম থেকেই শরী‘আত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেগুলো হচ্ছে হদ, কিসাস ও দিয়াত।

দ্বিতীয় প্রকার: ঐসব শাস্তি যার প্রকার বা স্বরূপ শরী‘আত বর্ণনা করেছে; কিন্তু তার পরিমাণ ধার্য করার দায়িত্ব বিচারকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক অপরাধের সাথে শাস্তির প্রকারগুলোর মধ্য থেকে যেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি নির্বাচন করবেন এবং শাস্তির মাত্রাও নির্ধারণ করবেন। এই শ্রেণির শাস্তিকে বলা হয় তা‘যীর (তিরস্কারমূলক শাস্তি)। শরী‘আত তা‘যীরের প্রকার বর্ণনা করে দিয়েছে। যেমন, বেত্রাঘাত, জেল, ভৎর্সনা ইত্যাদি। বিচারক এগুলোর মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করে মাত্রা বা পরিমাণ ঠিক করে দিবেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি যদি কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত নির্বাচন করেন, তা হলে সে বেত্রাঘাত দশটি হবে না-কি বেশি

[৪] আল-মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ-২১১।

হবে, তার পরিমাণও বলে দিবেন। তবে শাস্তির ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ বিচারকের ইখতিয়ার তার খেয়াল-খুশীমত হবে না; বরং তা হবে বিধিবদ্ধ নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে। বিচারকের কর্তব্য সেসব নিয়ম রক্ষা করা। সামনে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তা‘যীর শাস্তির ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব বিচারক বা নির্বাহী প্রধানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও ইসলামী শরী‘আতই এর উৎস মূল। শাস্তি আইনের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এমন কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না, যা ইসলামী উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে নির্ধারিত হয় নি। সুতরাং শাস্তির আইন বিধিবদ্ধ থাকাই ইসলামী শরী‘আতে শাস্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য।

২১. ইসলামে শাস্তির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য শাস্তির স্বাতন্ত্র্য। এর অর্থ, শাস্তির মূলে বা অপরাধের সাথে জড়িত নয় -এমন ব্যক্তির ওপর শাস্তি প্রয়োগ না হওয়া। এ বিষয়ের মূলনীতি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [فاطر: ١٨]

“কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১৮]

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَآءَ فَعَلَيۡهَاۖ﴾ [الجاثية: ١٥]

“যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণেই তা করে। আর যে মন্দ কাজ করে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে।” [সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ১৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه».

"কোনো লোককে তার পিতার পাপে বা ভাইয়ের পাপে অভিযুক্ত করা যাবে না।"

বস্তুত: শাস্তির স্বাতন্ত্র্যসত্তার দাবী হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং স্বজনের পাপে স্বজনকে এবং বন্ধুর পাপে বন্ধুকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের প্রথম যুগের মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে। সে কারণে তাদের অপরাধে তাদের স্বজনদেরকে মুসলিমরা অভিযুক্ত করে নি। ভুলবশতঃ হত্যায় অপরাধীর স্বজনদের ওপর দিয়াত (রক্তমূল্য) আরোপ করায় এ স্বাতন্ত্র্য লোপ পায় না বা ক্ষুণ্ণ হয় না। কেননা, স্বজনদের ওপর দিয়াত আরোপে অপরাধীর শাস্তি প্রত্যাহার হয়ে স্বজনদের ওপর চলে যায় না কিংবা তাদেরকে দিয়াতের শাস্তিতে শরীকও গণ্য করা হয় না। বস্তুত স্বজনদের ওপর দিয়াত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে অপরাধীর প্রতি সহানুভুতি ও সহযোগিতা প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, স্বজনদের পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার অপরাধীর রয়েছে। তাই বলে বলা যাবে না যে, সাহায্য-সহানুভুতি দেখানো স্বজনদের ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব বলা হলে তা আর সহানুভুতির পর্যায়ে থাকে না; বরং এটা হয়ে যাবে অপরাধীর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিরপরাধীর ওপর আরোপ করার শামিল। এ দ্বারা শাস্তির স্বাতন্ত্র্য ভুলুণ্ঠিত হয়; কিন্তু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শরী'আত কখনও এমন ব্যক্তির ওপর সহমর্মিতা দেখান ওয়াজিব করে দেয়, যে আদৌ পাপ করে নি। যেমন দরিদ্র অভাবী প্রতিবেশীকে সাহায্য করা ধনীর ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে। এখানে সাহায্যের ভিত্তি হচ্ছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শন। শরী'আত একে দরিদ্র প্রতিবেশীর পক্ষে ধনীর ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছে। এমন কি

সে যদি তা স্বেচ্ছায় দিতে অস্বীকার করে তা হলে আদালত তাকে বাধ্য করবে। তারপরে আরও বলা যায় যে, স্বজনদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হওয়া পুরস্কার অনুপাতে দণ্ড (الغرم بالغنم) নীতির বাস্তবায়ণ। স্বজনদের সকল সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মিরাছ হলো পুরস্কার। ওয়ারিছসূত্রে প্রাপ্ত এ পুরস্কার তারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। তেমনিভাবেই তারা ঋণের ভারও নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। সেই ঋণ হলো দিয়ত। কিছু সংখ্যক ফকীহ স্বজনদের ওপর দিয়াত ধার্যের ভিন্ন এক ব্যাখ্যা দেন। তার সার সংক্ষেপ হলো, স্বজন বা নিকট জ্ঞাতিদের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। যাতে তারা নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বল্গাহীনভাবে না বেড়ায় এবং কোনো প্রকার অপরাধে লিপ্ত না হয়। যদি তাদের মধ্যে কেউ ভুলক্রমে হত্যা করার ঘটনা ঘটায় তা হলে বুঝা যাবে তার স্বজনরা এই অপরাধীর বেলায় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন, উদাসীন ও অদূরদর্শী হয়ে সে ভুল হত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে, যা একটি বড় ধরনের অপরাধ। সুতরাং আবশ্যকীয় দায়িত্ব পলনে ত্রুটি করায় এই অপরাধীর সাথে স্বজনদের ওপরও দিয়াত ওয়াজিব হবে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের যে কোনোটি গ্রহণ করা হোক না কেন স্বজনদের ওপর দিয়াত ওয়াজিব হওয়ায় শাস্তির স্বতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয় না।

২২. ইসলামে শাস্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য শাস্তির সর্বজনীনতা। অপরাধী যেই হোক ইসলামের শাস্তি বিধান তার ওপর কার্যকর হবে। কেউ এর থেকে রেহাই পাবে না। এখানে শাসক-শাসিত, শরীফ-ইতর, উচ্চ শ্রেণি-নিম্ন শ্রেণি, ধনী-গরিব, নরী-পুরুষ ও সবল-দুর্বলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করতে শরী'আত কঠোরভাবে নিষেধ

করেছে। পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দণ্ডবিধি সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকরি না করা গোটা জাতি ধ্বংসের কারণ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها».

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হয়েছে; কারণ তাদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণির কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। পক্ষান্তরে কোনো দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে দণ্ডিত করা হত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দিব।"

বস্তুত ইসলামে শাস্তি প্রয়োগের এ সমতা নীতিই সমাজের সেসব প্রভাবশালী লোকদেরকে দমিয়ে দিতে সক্ষম যারা তাদের শক্তির জোরে অপরাধ কর্মে আকৃষ্ট হয়। তাদের মনে যদি এই ধারণা থাকে এবং আশা পোষণ করে যে, সামাজিক প্রভাবের কারণে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে তা হলে তো তারা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি তারা এ শাস্তিকে পূর্ণ সমতার সাথে কঠোরভাবে প্রয়োগ থেকে দেখে তা হলে তারা দমে যাবে। তাদের বাতিল ধান্দা আর সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তারা যত বড় ক্ষমতাধর হোক না কেন শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কেননা রাষ্ট্রের শক্তি তাদের শক্তি থেকে অনেক বড়। ফলে সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোক স্বস্তি লাভ করবে এবং তাদের জান, মাল ও সম্মান প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ মনে করবে। এ অবস্থায় সে যে কোনো প্রভাবশালী লোকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কারণ রাষ্ট্র তার পক্ষে আছে। আইনের দৃষ্টিতে শাস্তির সমতা রক্ষা করা যখন ওয়াজিব তখন তা সকলের জন্য সমানভাবে

প্রযোজ্য হবে। সুপারিশ বা অন্য কোনো পন্থায় অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ﴾ [النساء: ٨٥]

“কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮৫]

যে ব্যক্তি অপরাধীর শাস্তি রহিত করার সুপারিশ করবে তার সুপারিশ নিঃসন্দেহে একটি মন্দ সুপারিশ বলে বিবেচিত হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره».

“যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর বিধান কার্যকর করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, সে মূলত: আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে।”

শর'ঈ শাস্তি মওকুফ করার জন্য সুপারিশ করা যেমন অবৈধ, তেমন অপরাধির কৃত অপরাধ ও শরী'আতের বিরোধিতার কারণে প্রাপ্ত শাস্তি বাতিল করা কিংবা ক্ষমা করে দিতে অপরাধীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা কর্তৃপক্ষের জন্য অবৈধ। চাই সে অর্থ বায়তুল মালে (রাজকোষে) জমা হোক বা অন্য কেউ ভোগ করুক। এ অর্থ ঘৃণিত অপবিত্র এবং ঘুষ।

২৩. এতক্ষণ শাস্তি সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা হলো তা শরী'আতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। তবে দু'টি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি বিষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ

ইসলামের দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থান বিবেচনা বিষয়ে। প্রথম ক্ষেত্র অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি বিষয়ে মতভেদ এ কারণে নয় যে, শরী'আতের শাস্তি বিধানে অসমতা আছে। এর কারণ অন্য কিছু। বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এই, হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের বিরুদ্ধে হদ জারি করা ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু জমহুর ফকীহগণের মত ভিন্ন। তারা মনে করেন, ইসলামের হদ জারি করা -নিজের বিরুদ্ধে হলেও -রাষ্ট্র প্রধানের ওপর বর্তায়। হানাফীগণের যুক্তি হলো, রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজের ওপর হদ বাস্তবায়ন বা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য নাগরিকদের ওপর যেহেতু হদ জারি করেন তিনিই। তাই নিজের ওপর হদ জারি করতে তিনি অপারগ। কেননা হদ জারি করা হয় লাঞ্ছনাসহ শিক্ষামূলক শাস্তি হিসেবে। এই জিনিস কেউ নিজের ওপর প্রয়োগ করতে পারে না। যখন শাস্তি বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে গেল, তখন শাস্তির হুকুম দেওয়ার অপরিহার্যতা আর থাকল না। তবে রাষ্ট্র প্রধান ব্যতীত আর যত আমলা ও প্রশাসক আছেন, তাদের ওপর হদ জারির ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই, যদি তারা হদের উপযুক্ত অপরাধ করেন। আর জমহুরদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, হদ জারির ক্ষেত্রে নাগরিক ও রাষ্ট্র প্রধান সবাই সমান। কোনো ভেদাভেদ নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গি অতি উত্তম। এ রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নীতি ছিল, যদি কিসাসের উপযোগী কোনো কাজ তাঁর থেকে প্রকাশ পেত তাহলে তার থেকে কিসাস (অনুরূপ বদলা) নেওয়ার আহ্বান জানাতেন। হদ যেহেতু আল্লাহর হক তাই একে কার্যকরী করার প্রতি মনোযোগী হওয়া অধিক প্রয়োজন। কারণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অশান্তির মূলোচ্ছেদ এর মধ্যেই নিহিত। জমহুরদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে, শরী'আতে শাস্তির

নির্দেশ একটি ‘আম বা সাধারণ নির্দেশ। শাসক-শাসিত সবাই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। অন্য দিকে অন্যায় অপরাধ করা সকলের জন্য হারাম নিষিদ্ধ। যার মধ্যে রাষ্ট্র প্রধানও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অন্যরা অপরাধ করলে যে শাস্তি পাবে, রাষ্ট্র প্রধান অপরাধ করলেও একই শাস্তি পাবে। বাকী থাকে শাস্তি বাস্তবায়ন করার বিষয়। এ ব্যাপারে জমহুর ফকীহগণ বলেন, রাষ্ট্র প্রধানের ওপর শাস্তি জারি করবে তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধি। কেননা এটা করা হবে তার কল্যাণে ও জনগণের কল্যাণে।[9]

২৪. মতভেদের দ্বিতীয় বিষয় শাস্তি কার্যকর করার স্থান নির্ণয় নিয়ে। ইসলামে শাস্তির সার্বজনীনতা স্থানকাল নির্বিশেষে সর্বত্র প্রযোজ্য । তবে এই সার্বজনীনতার বাস্তব প্রয়োগ ইসলামী রাষ্ট্রেই (দারুল ইসলাম) সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে অবস্থানকারী সকলের ওপর এ নির্দেশ কার্যকর হবে। ইসলামী শরী‘আত মূলত: একটি বিশ্ব ব্যবস্থা। তাই এর শাস্তি বিধান মূলগতভাবে সকল মানুষের জন্য প্রণীত। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না থাকায় কেবল ইসলামী রাষ্ট্রেই এর প্রয়োগ সীমিত। অন্য দেশে নয়। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-র নিম্নোক্ত বক্তব্যে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘শরী‘আতের মূল দাবী হচ্ছে তার বিধান সকল মানুষের জন্য সর্বব্যাপী। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে (দারুল হারব) কর্তৃত্ব না থাকায় তথায় জারি করা সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে সম্ভব বিধায় এখানে জারি করা অপরিহার্য।’[10] এ নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামী রষ্ট্রে সংঘটিত সকল অপরাধে শর‘ঈ শাস্তি প্রয়োগ হবে। অপরাধ কে করল

---

[9] এ মাসয়ালার বিস্তারিত বর্ণনা ও উভয় পক্ষের দলীল এর জন্য দেখুন, আহকামুয যিম্মিয়্যিয়িন ওয়াল মুসতামিনিন ফি দারিল ইসলাম।

[10] বাদাইয়ুস সানা‘ঈ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১১।

তার জাতপাত বা ধর্মের দিকে তাকাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। মুসলিম, জিম্মি, আশ্রয় গ্রহণকারী সবার ওপর এ শাস্তি কার্যকর হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতার ব্যাপকতার এটাই সাধারণ নিয়ম। তদুপরি মুসলিম ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী বিধান নিজের ওপর বাধ্য করে নেয়। জিম্মি চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় এ বিধানকে মেনে নেয়। অনুরূপ আশ্রয়প্রার্থী ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করায় যতদিন থাকবে ততদিন এ বিধান শিরোধার্য করে নেয়। অথবা সে যদি এ আইন না মেনে আশ্রয় গ্রহণ করে তবুও তার ওপর এ আইন স্বাভাবিকভাবে কার্যকর হবে, যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ক্ষমতা দেশের সকল জনগোষ্ঠীর ওপর সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত।

উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম তা এ বিষয়ের সাধারণ নিয়ম। তবে শাখা মাসয়ালায় ফকীহগণের মধ্যে জিম্মিদের ব্যাপারে অল্প এবং আশ্রয় প্রার্থীদের ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা ও তদীয় শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে না যা কেবল আল্লাহর হক; বরং তাদেরকে তা'যীর বা লঘু দণ্ড দেওয়া যাবে। জমহুরগণ এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, তাদের ওপর হদ জারি করতে হবে। অনুরূপভাবে জমহুর ফকীহগণ জিম্মি ও আশ্রয় গ্রহণকারীগণকে মদ্য পানের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার কথা বলেন। কেননা অমুসলিমরা তাদের ধর্মমতে মদ্যপানকে হারাম জানে না। আহলে জাহেরগণ এ মাসয়ালায় জমহুরদের বিপক্ষে বলেন। তাদের মতে মদখোর শাস্তি পাবে। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: শাস্তির প্রকারভেদ

২৫. ইসলামী শরী'আতে শাস্তি বিভিন্ন দিক দিয়ে কয়েক প্রকারে বিভক্ত।

প্রথম প্রকার: শাস্তির মৌলিকত্ব। এদিক দিয়ে শাস্তি তিন প্রকার। মৌলিক শাস্তি, আনুষাঙ্গিক শাস্তি ও সম্পূরক শাস্তি (أصلية، تبعية ও تكميلية) অপরাধের জন্য শরী'আত নির্ধারিত শাস্তিকে বলে মৌলিক শাস্তি (عقوبة أصلية)। যেমন, চুরির জন্য হাত কর্তন করা। মৌলিক শাস্তি প্রয়োগে শর'ঈ বাধা থাকলে বিকল্প যে শাস্তি দেওয়া হয় তাকে বলে বদলিয়া (بدلية) যেমন, চুরির শাস্তিতে হাত কর্তনের শর্ত পূরণ না থাকলে তাকে তা'যীর শাস্তি দেওয়া। মৌলিক শাস্তির হুকুমের সাথে অপরাধির ওপর আরও যেসব শাস্তি অনায়াসে এসে পড়ে সেগুলোকে বলে আনুষাঙ্গিক শাস্তি (عقوبة تبعية)। যেমন, হত্যাকারীর ওপর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম জারি হলে সে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হয়। সম্পূরক শাস্তির (عقوبة تكميلية) উদাহরণ, যেমন চোরের হাত কর্তনের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্তিত হাত তার কাধে ঝুলিয়ে রাখা।

২৬. **দ্বিতীয় প্রকার:** শাস্তির পরিমাণ। এ দিক দিয়ে শাস্তি দু প্রকার। নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। নির্ধারিত শাস্তির ধরন ও পরিমাণ শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর বাইরে ফয়সালা দেওয়ার ইখতিয়ার বিচারকের নেই। যেমন, (অবিবাহিতের) ব্যভিচারের শাস্তিতে বেত্রাঘাত। অনির্ধারিত শাস্তির ধরণ নির্ধারণের পর এর পরিমাণ নির্ধারণের ইখতিয়ার শরী'আত বিজ্ঞ বিচারকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যেমন, তা'যীরের শাস্তি।

২৭. **তৃতীয় প্রকার:** শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র। অপরাধীর যে স্থানে শাস্তি পতিত হয় তা কয়েক প্রকার থেকে পারে। যেমন,

এক. শারীরিক শাস্তি: অপরাধীর দেহে এ শাস্তি পতিত হয়। যেমন বেত্রাঘাত।

দুই. মানসিক শাস্তি যা অপরাধীর অন্তরে পীড়া ও যাতনা সৃষ্টি করে। যেমন, ভীতি প্রদর্শন করা।

তিন. আর্থিক শাস্তি যা অপরাধীর অর্থ-সম্পদের ওপর আরোপ করা হয়। যেমন দিয়ত।

চার. অপরাধীর স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ। যেমন জেল, কারাদণ্ড।

২৮. **চতুর্থ প্রকার:** শাস্তির ধরণ। অপরাধের বিচারে যেসব শাস্তি আরোপ হয়ে থাকে তা তিন প্রকার। হুদুদ, কিসাস ও দিয়াত এবং তা'যীর। প্রথম প্রকার হুদুরের আওতাভুক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত। যেমন, ব্যভিচার ও চুরি। দ্বিতীয় প্রকার কিসাস ও দিয়াতের অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, হত্যা ও যখম এবং তৃতীয় প্রকার তা'যীরের অপরাধের জন্য প্রবর্তিত। যেমন, সুদ খাওয়া। কাফফারার শাস্তিকেও শেষোক্ত দুই প্রকারের সাথে যুক্ত করা যায়। কেননা কোনো কোনো তা'যীর এবং কিসাস ও দিয়াতের অপরাধের ক্ষেত্রে এ শাস্তি আরোপ করা হয়। কাফফারার শাস্তি ব্যতীত অন্যান্য শাস্তি প্রসঙ্গে আমরা এখানে নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করব। প্রথম অনুচ্ছেদে হুদুদ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কিসাস ও দিয়াত এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে তা'যীর। কারণ শাস্তির মধ্যে এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম অনুচ্ছেদ: হুদূদ (حدود)

২৯. হুদুদ শব্দটি হদ এর বহুবচন। হদ এ আভিধানিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করা (المنع) ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, অপরাধের যে সব শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করে দিয়েছে সেসব শাস্তিকে হদ বলে। এ শাস্তি ধার্য করা আল্লাহর হক বা অধিকার (عقوبة مقدرة من قبل الشرع وجبت حقا لله تعالى)[১১] কারণ জনগণের কল্যাণ সাধন ও দুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহ এ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং যেসব অপরাধের ক্ষতি ও বিপর্যয় জনগণের ওপর বর্তায় এবং অপরাধীর শাস্তির ফায়দা জনগণ ভোগ করে সেসব শাস্তি আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত। জনগণের হককেই বলা হয়েছে আল্লাহর হক। এ শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ায় এর গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমন একে রহিত করার ক্ষমতা কারও নেই। কেউ রহিত করলেও এটা রহিত হয়ে যায় না। এ পরিভাষা অনুযায়ী কিসাস হদের আওতায় আসে না। যদিও তা শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কারণ কিসাসের মধ্যে বান্দার হক থাকে প্রবল। অনুরূপ তা'যীরও হদের মধ্যে গণ্য হয় না। কারণ তা'যীরের শাস্তি শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়। হদের উপরোক্ত পারিভাষিক অর্থ জমহুর ফকীহদের থেকে বর্ণিত। তবে কোনো কোনো ফকীহ হদের ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে, শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তিকে হদ বলে (الحد هو العقوبة المقدرة شرعا)। এর সাথে আল্লাহর হক হিসেবে ধার্য হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাদের এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কিসাস ও দিয়াত হদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উভয় শাস্তিই বান্দার হক হিসেবে শরী'আত কর্তৃক

---

11 আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ লিল মাওয়ারদী, পৃ-২১২।

নির্ধারিত।

জমহুরদের সংজ্ঞায় হুদুদ হলো:

هي العقوبة المقدرة من قبل الشرع لجرائم محدودة.

“শরী‘আত কর্তৃক সেসব শাস্তি যা কতগুলো নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য প্রবর্তিত।” অপরাধগুলো হচ্ছে, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি (রাহাজানী), বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগ। এ সকল অপরাধের বিবরণ নিম্নরূপ:

এক. ব্যভিচারের শাস্তি

৩০. ব্যভিচারের শাস্তি জালদ, তাগরীব ও রজম। জালদ অর্থ বেত্রাঘাত করা, চাবুক মারা। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এ শাস্তি প্রমাণিত।

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾ [النور: ٢]

“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর।” [সূরা আন-নূর: ২]

তাগরীব অর্থ নির্বাসন দেওয়া। হাদীস থেকে এ শাস্তি প্রমাণিত।। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».

“অবিবাহিত নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।”

তাগরীব দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যভিচারী যে শহরে ব্যভিচার করে তাকে অন্য শহরে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা।

আর রজম অর্থ ব্যভিচারীকে প্রস্তর বা অনুরূপ বস্তু নিক্ষেপে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কর্মনীতির মধ্যে এর প্রমাণ বিদ্যমান। মা'য়িয ইবন মালিক আসলামীকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে গামিদ থেকে আগত নারীকেও তার নির্দেশে রজম করা হয়েছিল। এছাড়া রজমের বিধানের ওপর সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী মুসলিমদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত।

মুহসিন ব্যভিচারী ব্যতীত রজম ওয়াজিব হয় না। মুহসিন হওয়ার শর্ত কয়েকটি। তন্মধ্যে একটি হলো বৈধ স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়া। অর্থাৎ ব্যভিচারী বৈধভাবে বিবাহিত হবে, বৈধ স্ত্রীর সাথে সহবাস থাকতে হবে এবং সে বালেগ ও বিবেকবান হবে। মুহসিন না হলে তার শাস্তি একশ চাবুক ও এক বছরের নির্বাসন।

লিওয়াতাত বা সমমৈথুন: জমহুরদের মতে লিওয়াতাত ব্যভিচারের সম অর্থ হিসেবে গণ্য। সুতরাং ব্যভিচারের যে শাস্তি লিওয়াতাতেরও সেই একই শাস্তি। ইমাম আবু হানিফার মতে লিওয়াতাত ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার ওপরে হদও ওয়াজিব নয়; বরং এর শাস্তি তা'যীর।[12] তবে জমহুরদের মতটি এখানে অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণ আছে, লিওয়াতাত কর্মে লিপ্ত উভয়কে হত্যা করার ব্যাপারে তারা একমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»

---

[12] বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৬৪-৩৬৫। আল-মাবসূত ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৪-৪৫।

“তোমরা যদি কাউকে কওমে লূতের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত দেখ তাহলে উভয়কে হত্যা কর।” পার্থক্য হলো, এ কুকর্মে জড়িতদের হত্যার বেলায় মুহসিন বা বিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত উভয়ের শাস্তি হত্যা। কারণ হাদীসে তাদের হত্যার ব্যাপারে বিবাহের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় নি। এছাড়া সাহাবীদের থেকে বিবাহের শর্ত ছাড়াই তাদেরকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এসব প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, সমমৈথুনকে যদিও ব্যভিচারের পর্যায়ে গণ্য করা হয়, কিন্তু সর্বাবস্থায় হত্যাই এর একমাত্র শাস্তি।”[13]

দুই. কযফ (ব্যভিচারের অপবাদ)

৩২. قذف (কযফ) এর আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা নিক্ষেপ করা বা আরোপ করা।। শরী‘আতে কযফ অর্থ কারও প্রতি ব্যভিচারের দোষ আরোপ করা । অর্থাৎ নির্দিষ্ট কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচারের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা। পবিত্র কুরআনে এরূপ অপবাদ দেওয়াকে হারাম এবং এর শাস্তি বেত্রাঘাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥﴾ [النور: ٤، ٥]

“যারা পবিত্রা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই সত্যত্যাগী। কিন্তু

[13] আল-মুগনী ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৫। বাদায়ে‘উস সানায়ে‘ঈ ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০।

এরপর যারা তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪-৫]

কুরআন মাজীদে কেবল পবিত্রা নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর হুকুম সৎ পুরুষদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং এর ওপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপরাধে যাদের ওপর হদ কার্যকর করা হয়েছে আদালতে কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। তবে সে যদি তওবা করে তাহলে ইমাম মালিক, ইমাম শাফে‘ঈ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. ও তাদের অনুসারীদের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, তওবা করলেও তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না।

৩৩. স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে হদ দাবী করে তাহলে স্বামীকে লি‘আন করতে হবে। যেভাবে এর বর্ণনা কুরআন ও সুন্নায় এসেছে এবং ফকীহগণ যেভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

তিন. মদ্যপান

৩৪. মদ : নেশা সৃষ্টিকারী যে কোনো জিনিসকে মদ বলে। তার মূল আংগুর হোক বা অন্য কিছু। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বহু হাদীস ও উক্তি বর্ণিত আছে। যেমন, বলা হয় كل مسكر حرام “নেশাজাত যে কোনো দ্রব্য হারাম।” সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত,

«ما أسكر كثيره فقليله حرام».

"যে দ্রব্য অধিক সেবনে নেশা হয় তার অল্পও হারাম।"

হাশীশ (এক ধরণের মাদকদ্রব্য) ও অনুরূপ যে সব জিনিসে নেশা উৎপন্ন হয় তা মদের মধ্যে গণ্য এবং সেবনকারী শাস্তির আওতাভুক্ত।

শরী'আতে মদ্যপানের শাস্তি বেত্রাঘাত। হাদীস শরীফে আছে,

«من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه».

"যে লোক মদ্যপান করে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর। আবার পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর। চতুর্থবার পান করলে হত্যা কর।"

তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদীসে বর্ণিত হত্যার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, এ হুকুম রহিত হয় নি, বলবৎ আছে। প্রয়োজনে বিচারক বা শাসক তা'যীর (দণ্ড) হিসেবে তা প্রয়োগ করবে।

বেত্রাঘাতের পরিমাণ চল্লিশটি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদ্দশায় এ সংখ্যা কার্যকর করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও এ সংখ্যা ঠিক রাখেন। কিন্তু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদ্যপায়ীকে আশি বেত্রাঘাত করেন। যে সব আলেম মদপানের নির্ধারিত শাস্তি (হদ) আশি বেত্রাঘাতের কথা বলেন, তারা উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কর্মনীতির অনুসরণ করেন। যেহেতু কারও থেকে এর বিরোধিতার প্রমাণ নেই, সুতরাং এটা ইজমা।

কোনো কোনো আলেম বলেন, চল্লিশ বেত্রাঘাতই হদ, তবে আদালত প্রয়োজন বোধ করলে এর উপরে বাড়াতে পারে তা'যীর হিসেবে। যেমন,

কারও যদি নেশা পান করা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয় এবং চল্লিশ বেত্রাঘাতে অভ্যাস পরিত্যাগ না হয়, তাহলে আদালত তার ক্ষেত্রে সংখ্যা বাড়াতে পারে। চল্লিশটি হবে হদ এবং বর্ধিত সংখ্যা তা‘যীর (দণ্ড)।

চার. চুরি

৩৫. হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, শরী‘আতের পরিভাষায় চুরি বলা হয়:

أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصابا محرزا للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة.

“অন্যের মাল গোপনে নিয়ে আসা, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়, সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হিফাযত করে রাখা হয়, যা দ্রুত নষ্ট না হয় এবং কোনো ব্যাখ্যা বা সন্দেহের অবকাশ না থাকে।”[14]

চুরির শাস্তি চোরের হাত কর্তন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨﴾ [المائدة: ٣٨]

“পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৮]

কর্তন করা হবে ডান হাতের কব্জি থেকে। হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত। অপহরণকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[14] আল ইনায়াতু ‘আলাল হিদায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২২৬।

«ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع».

“অপহরণকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর হাত কর্তন হবে না।” তবে এদের ওপর তা‘যীর বা দণ্ড আসবে, যেমন, চুরির শর্ত পূরণ না হলে তা‘যীর আসে। উদাহরণস্বরূপ, চুরির মাল যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তখন হাত কাটা যাবে না বটে; কিন্তু তা‘যীর ওয়াজিব হবে।

পাঁচ. হারাবা (ডাকাতি)

৩৬. হারাবা একটি অপরাধ। এর অর্থ পথিকের ওপর প্রকাশ্যে হামলা চালিয়ে জোরপূর্বক তার মালামাল লুট করা এবং এমন ত্রাস সৃষ্টি করা যার কারণে সে পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজ একজনে করুক বা দলবদ্ধ হয়ে করুক, সংগে অস্ত্র থাকুক বা না থাকুক,[15] শহরের মধ্যে হোক বা বাইরে, তাতে অপরাধের মধ্যে কোনো তারতম্য হবে না। আল্লাহ তা‘আলা এ অপরাধের শাস্তির কথা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করেন।

﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٤]

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাংগামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ান হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিকে থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের

---

[15] বাদায়িউস সানা‘ঈ, ৭ম খণ্ড, পৃ-৯১-৯২, শরহুল খুরাশী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৪।

জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কিন্তু যারা তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে তওবা করে তাদের জন্য নয়। জেনে রেখ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩৩-৩৪]

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ও ফকীহগণের বিশ্লেষণমতে ডাকাতির শাস্তি নিম্নরূপ: ডাকাত যদি হত্যা করে ও মাল লুট করে তা হলে তাকে হত্যা করা হবে ও শূলে চড়ান হবে। আর যদি হত্যা করে মাল লুট না করে তা হলে হত্যা করা হবে কিন্তু শূলে চড়ান হবে না। যদি মাল লুণ্ঠন করে হত্যা না করে, তা হলে তার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। আর যদি হত্যা ও লুণ্ঠন না করে শুধু পথে ত্রাস সৃষ্টি করে, তবে তাকে নির্বাসনে দিতে হবে। মালেকী মাযহাব মতে, ডাকাত যদি শুধু লুণ্ঠণ করে, হত্যা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা, শূলে চড়ানো ও হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তনের ব্যাপারে আদালতের ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু ডাকাত যদি কেবল রাস্তায় ত্রাস সৃষ্টি করে, হত্যা ও লুণ্ঠণ না করে তাহলে তাকে হত্যা করা, শূলে চড়ানো, হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা ও নির্বাসিত করার ব্যাপারে বিচারক বা শাসকের ইখতিয়ার থাকবে।[16]

আয়াতে উল্লিখিত নির্বাসনের অর্থ অপরাধীকে অন্য শহরে বন্দী করে রাখা। এ সংক্রান্ত যতগুলো ব্যাখ্যা আছে তন্মধ্যে এ ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম। আর হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তনের অর্থ, ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা।[17]

---

[16] আস সিয়াসাতুশ শর‘য়িয়্যাহ লি ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ-৮২-৮৩, আল মুগনী ৮ম খণ্ড, পৃ-২২৮।

[17] আস সিয়াসাতুশ শর‘য়িয়্যাহ, পৃ-৮৩, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮০, শরহুল খুরাশী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৫-১০৬।

অপরাধ যে ঘটায় ও যে তাকে সহায়তা করে উভয়ের শাস্তি একই। কেননা সহায়তাকারীর শক্তি ও সাহায্য পেয়েই সে অপরাধ ঘটাতে সক্ষম হয়। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ডাকাতদলের মাত্র একজনও যদি হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং বাকী সবাই তাকে সাহায্য করে তবে জমহুরদের মতে দলের সবাইকে হত্যা করা হবে, সংখ্যায় যদি তারা একশজনও হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের ‘আমল থেকে এ নিয়ম প্রচলিত আছে। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু লড়াইকারীদের সাথে পর্যক্ষেণকারীদেরও হত্যা করেছিলেন।[18]

ছয়. বিদ্রোহ

৩৭. সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ দাবি নিয়ে একটি শক্তিশালী দলের অভ্যুত্থানকে বিদ্রোহ বলে।

বিদ্রোহীদের শাস্তি: বিদ্রোহীরা যদি প্রকাশ্যভাবে সরকারের অবাধ্য হয়, নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকে, সরকারের প্রাপ্য আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় এবং ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনে নামে ও লড়াই করার প্রস্তুতি নেয়, তারা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে বিকল্প শাসক ঠিক করুক বা না করুক, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। এটাই তাদের শাস্তি। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, বিদ্রোহীরা যদি প্রথমে কার্যত লড়াই শুরু নাও করে তবুও মুসলিম শাসককে তাদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চালাতে হবে। কেননা তাদের জড়ো হওয়া ও লড়াইয়ের আয়োজন করাই প্রমাণ করে যে, অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং যুদ্ধ করতে তারা সংকল্পবদ্ধ। তাই সরকারের উচিৎ তাদের অপতৎপরতা চরমে পৌঁছার আগে ও তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা অসম্ভব হয়ে উঠার

---

18 প্রাগুক্ত।

পূর্বে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। তবে লড়াই শুরু করার পূর্বে সরকারের কর্তব্য তাদেরকে চিন্ত-ভাবনা করার জন্য কিছু অবকাশ দেওয়া। যদি তারা আনুগত্য মেনে নেয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে আর লড়াই করা বৈধ নয়। কিন্তু সাড়া না দিলে অবিলম্বে অভিযান চালাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: ৯]

“যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।” [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ৯]

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই তাদের শাস্তি। অর্থাৎ বিদ্রোহ দমন করার জন্য ও বিদ্রোহীদের বশে আনার জন্য যতটুকু রক্তপাত ও সম্পদ হরণ করা প্রয়োজন ততটুকু করা বৈধ। যদি তারা রণে ক্ষ্যান্ত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করা ওয়াজিব। তবে বিদ্রোহ করার অপরাধে আদালত তাদেরকে তা'যীর দণ্ড দিতে পারবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সরকারের দমন অভিযানে শাস্তির সেই চিরাচরিত অর্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, যা ব্যক্তির ওপরে প্রয়োগ হলে দেখা যায়; বরং এটাকে বলা যায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু ফকীহগণ একে হুদুদের মধ্যে গণ্য করেন। কেননা এর মধ্যে বিদ্রোহীদের হত্যার বৈধতা নিহিত আছে। শাস্তি হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে এ হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা আল্লাহর হক হিসেবে ওয়াজিব। ফকীহদের বক্তব্য এখানে সুস্পষ্ট। সে

কারণে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গৃহীত লড়াইকে হুদুদের মধ্যে গণ্য করতে কেউ বিরোধিতা করে নি।

সাত. মুরতাদ

৩৮. মুরতাদের আভিধানিক অর্থ ত্যাগকারী, প্রত্যাবর্তনকারী। শরী'আতের পরিভাষায় ইসলাম ত্যাগকারীকে বলা হয় মুরতাদ। ত্যাগ করার অর্থ: তার থেকে এমন কিছু আচরণ প্রকাশ পায়, যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। যেমন, দীনের সুস্পষ্ট কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গাল-মন্দ করা।

মুরতাদ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। যেমন, জ্ঞান ও সংকল্পের অধিকারী হওয়া। সুতরং পাগল ও অবুঝ বালকের ধর্মত্যাগ গ্রহণগোগ্য নয়। মাতাল না হওয়া। তাই নেশার কারণে যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে তার ধর্মত্যাগ ধর্তব্য নয়। অনুরূপ যুলুম-নিপীড়নে বাধ্য হয়ে যে মৌখিকভাবে ধর্মত্যাগ করে; কিন্তু অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় থাকে (মুকরাহ) সেও মুরতাদ নয়। মুরতাদ হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। হানাফীদের নিকট বালেগ হওয়াও শর্ত নয়। তবে অন্য ফকীদদের মতে বালেগ হওয়া শর্ত।

মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من بدل دينه فاقتلوه».

“যে ব্যক্তি দীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।”

হত্যা কার্যকর করার পূর্বে মুরতাদকে তিন দিনের অবকাশ দেওয়া হবে। হয়তো ভুল পথ ছেড়ে সে স্বধর্মে ফিরে আসবে। এ অবকাশ দেওয়া

জমহুরদের মতে ওয়াজিব, হানাফীদের মতে মুস্তাহাব। অবকাশকালীন সময়ে যদি সে ফিরে আসে, তবে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

হুদূদ শাস্তি প্রবর্তনের হিকমত

৩৯. হুদূদের বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তির সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছে। নীতিটি হচ্ছে, **অপরাধের সাথে শাস্তির সমতা ও সামঞ্জস্যতা রক্ষা**। ন্যায়নীতি ও সুবিচারের জন্য এটা অপরিহার্য। এ শাস্তির মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কষ্ট যাতনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা অপরাধ ঘটাবার আগে মানুষকে সতর্ক করে ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধা দেয়।

এ শাস্তির বিশেষত্ব এই যে, **অপরাধী ব্যতীত অন্যের ওপর কখনও আরোপ হয় না**। এ কারণে এর নিঁখুত প্রয়োগ সমাজকে ক্ষতি ও বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা করে সমাজের কল্যাণ সাধন করে। ফলে অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অন্ততঃপক্ষে বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি-স্থিতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে এসব শাস্তি **অপরাধ করতে উৎসুক ব্যক্তির সামনে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়**। তারপরেও যদি সে অপরাধ করে ফেলে তাহলে শাস্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে সে সংশোধন হয় এবং শাস্তি তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। সন্দেহ নেই, কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার মধ্যে তার জন্য বড় ধরণের কল্যাণ নিহিত থাকে। কেননা তখন তাকে শাস্তির কষ্ট ভোগ করতে হয় না। শরী'আত লংঘন করার দায় ঘাড়ে নিতে হয় না এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পরকালের 'আযাব থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায়। আবার

অপরাধ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হলে তাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ, তখন সে দুনিয়ায় গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। প্রদত্ত শাস্তি তার সুপ্ত ঈমানকে জাগ্রত করে দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে তার বড় স্খলণের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। ফলে সে তওবায়ে নাসূহা করার সৌভাগ্য লাভ করে। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইসলামে শাস্তি বিধান প্রবর্তনের পেছনে যে সব মহান লক্ষ্য ও হিকমত নিহিত আছে এগুলো তার সামান্য কয়েকটি দিক মাত্র।

ইসলামের শাস্তি বিধানের ওপর আপত্তি

৪০. বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায়, ইসলামে শাস্তির এ বিধানগুলো যে কোনো বিবেচনায় সর্বাধিক উপযুক্ত। অপরাধ থেকে সতর্ক ও সংযত থাকার জন্য যথেষ্ট, ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ এবং শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত উপায়। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোককে এর ওপর প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করতে দেখা যায়। তারা তাদের আপত্তিগুলোকে বিবেকের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবী করে ইসলামের শাস্তি ব্যবস্থাকে পরিত্যাজ্য, প্রয়োগ অযোগ্য মনে করে এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে। বিদগ্ধ পাঠকের সামনে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য আমরা এখানে তাদের আপত্তি ও জবাব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। আপত্তিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১. সামগ্রিক শাস্তি সম্পর্কে সাধারণ আপত্তি ও ২. প্রত্যেক শাস্তির ওপর পৃথক আপত্তি।

সাধারণ আপত্তি ও তার জবাব

প্রথম আপত্তি

৪১. আপত্তিকারীগণ বলেন, শাস্তির এ বিধান দ্বারা অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য

করা হয়েছে এবং একই অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদেরকে একই শাস্তির যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ তাদের মন মানসিকতা, স্বভাব-প্রকৃতি, পরিবেশ-পারিপার্শিকতা, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-সামাজিকতা ইত্যাদির মাপকাঠি এক নয়, বিভিন্ন প্রকার। তাই তাদেরকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করার পন্থা পদ্ধতিও এক হতে পারে না, বিভিন্ন রকম হওয়া স্বাভাবিক। এ এমন একটি বিষয়, যা কোনো মতেই উপেক্ষা করা যায় না। এ কারণে সকল অপরাধীর একই শাস্তি না হয়ে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া অপরাধী একজন মানসিক রোগী, ভংগুর ব্যক্তিত্ব ও ভারসাম্যহীন স্বভাব-প্রকৃতির লোক। সুতরাং তাকে উপরোক্ত অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে বিচার করতে হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রোগীর চিকিৎসার মনোভাব নিয়ে। তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা সুস্থ্য-সবল পরিপূর্ণ মানুষ মনে করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

আপত্তির জবাব

ইসলামী শরী'আত শাস্তির বিধান প্রবর্তনকালে অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে নি; বরং তা বিবেচনায় রেখেছে ও মূল্যায়ন করেছে। আপত্তিকারীদের সাথে আসল মতভেদ অপরাধীর ব্যক্তিত্বের পরিধি ও বিস্তৃতি নিয়ে। শরী'আত বলছে, অপরাধী যদি বালেগ হয়, বিবেকবান হয় ও স্বাধীন মতামতের অধিকারী হয়, সেই সাথে চৈতন্যহীন ও পাগল না হয়, কারও চাপে বাধ্য না হয় এবং নিরূপায় ও অজ্ঞ না হয় কেবল তখনই সে শাস্তির যোগ্য হবে। এগুলোই তার ব্যক্তিত্বের বিবেচনার বিষয়। এর কোনো একটি অবস্থা তার মধ্যে পাওয়া গেলে হদ রহিত হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে অন্য শাস্তি দেওয়া হয়, যার বিবরণ ফকীহগণের কিতাবে লিখিত আছে।

উদাহরণস্বরূপ, ব্যভিচার ও চুরির শাস্তিতে শরী'আত অপরাধীর অবস্থা বিবেচনা করেছে। সুতরাং বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি করা হয়েছে রজম আর অবিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে কুমারত্ব থাকায় সে এটুকু ছাড় পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি এ ছাড় পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। অনুরূপ সাধারণ চুরি বা ছোট চুরির ক্ষেত্রে (ফকীহদের পরিভাষায় سرقة الصغرى) হাত কাটার বিধান আছে। পক্ষান্তরে বড় চুরি বা ডাকাতির বেলায় (سرقةالكبرى) শাস্তি বৃদ্ধি করে হাত ও পা কাটার বিধান করা হয়েছে। এটা হলো সে সীমারেখা যেখানে এসে শরী'আত থেমে গেছে এবং জানিয়ে দিয়েছে, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব কতটুকু বিবেচনা করা যাবে এবং তার অবস্থা ও পরিবেশের কতটুকু উপেক্ষা করা হবে না।

এরপর থাকে অপরাধীর স্বভাব, পরিবেশ, ঐতিহ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য। আপত্তিকারীগণ এগুলোকে অপরাধীর ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন। কিন্তু শরী'আত তা স্বীকার করে না। কারণ, এর মধ্যে কোনোটিই এসব অপরাধে জড়িত হওয়ার জন্য ওযর হতে পারে না এবং অপরাধী যদি বলেগ, বিবেকবান এবং সিদ্ধামত নেওয়ার যোগ্য হয় তাহলে এসবের দ্বারা তার নির্ধারিত শাস্তি হ্রাসও হতে পারে না। তাছাড়া এ বৈশিষ্ট্যগুলো সদা পরিবর্তনশীল। কোনো মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর কোনো চুড়ান্ত সীমাও নেই। তাই এগুলো যদি বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে সমাজে অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং অপরাধীরা শাস্তির আওতা থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে ছড়িয়ে পড়া এ ভয়াবহ অপরাধের কারণে সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে বাধ্য হবে। অথচ শাস্তির ভয় তাদেরকে অপরাধ থেকে সংযত থাকতে বাধ্য করত।

আপত্তিকারীগণ সহানুভূতি দেখিয়ে শাস্তিকে রোগীর চিকিৎসার সাথে তুলনা করতে আগ্রহী। আমাদের বক্তব্য হলো, এরূপ সহানুভূতি দেখান শরী'আতেই একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি এবং আলোচ্য শাস্তি বিধানেও তা বিদ্যমান। কারণ শাস্তির মূল দৃষ্টিভঙ্গীই হলো রহমত ও দয়া প্রদর্শন। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেন নি যে, চিকিৎসার মধ্যে এমন শর্ত দেওয়া নেই যে, তা রোগীর নিকট কেবল সুস্বাদু ও তৃপ্তিকরই হবে; বরং কখনও কখনও বিস্বাদ ও তিক্তও হয়ে থাকে। চিকিৎসার স্বার্থে রোগীকে অনেক সময় বিভিন্ন রকম অস্ত্রোপচার ও অঙ্গচ্ছেদ করা প্রয়োজন হয়। তা সত্ত্বেও এ কাজকে রোগীর জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল বলে গণ্য করা হয়। কেউ একে প্রতিশোধ বলে মনে করে না। ইসলামের শাস্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই একই কথা। শাস্তি সেসব লোকের চিকিৎসা হিসেবে দেওয়া হয় যাদেরকে অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখতে আদেশ-উপদেশ, সতর্ক-সাবধানরূপ চিকিৎসায় কোনো কাজ হয় নি। অবশেষে তাদের ওপর শাস্তিরূপ চিকিৎসা প্রয়োগ করা জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, উপদেশ চিকিৎসা বারবার প্রয়োগ করলেও কারও কারও ক্ষেত্রে কোনো ফায়দা যে হয় না, অপরাধে জড়িত হওয়াই তার প্রমাণ। বারবার উপদেশ দিয়ে কেবল অপাত্রে ঘি ঢালাই হয়েছে। সে জন্য বিকল্প চিকিৎসা অবলম্বন করা অপরিহার্য। সে চিকিৎসার নাম শাস্তি।

দ্বিতীয় আপত্তি ও তার জবাব

৪৩. সামগ্রিক শাস্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে দ্বিতীয় আপত্তি: ইসলামের শাস্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর। অপরাধের পরিমাণের সাথে শাস্তির কষ্ট-যাতনার কোনো সামঞ্জস্য নেই। এটা সুবিচার নয় বরং যুলুম।

৪৪. এ আপত্তি অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। স্মরণ রাখা দরকার যে, শাস্তিটা

কোনো বৈধ পূণ্যময় কর্মের বিনিময় নয় যে, তাতে কঠোরতা ও কষ্ট-যাতনা থাকবে না। শাস্তি হলো কোনো অপকর্ম বা ধবংসাত্মক কাজের সংকল্প করা এবং সেই সংকল্প কাজে পরিণত করার বদলা। তাই এর মধ্যে কষ্ট-যাতনা অবশ্যই থাকবে। অপরাধের সাথে শাস্তির যন্ত্রণার সামঞ্জস্য না থাকার ও সুবিচারপূর্ণ না হওয়ার যে অভিযোগ তারা দেন তা সঠিক নয়। আমার ধারণায় এ অভিযোগের কারণ, তারা তাদের দৃষ্টিকে কেবল শাস্তির মধ্যে নিবদ্ধ রেখেছেন। অপরাধের দিকে তাকান নি এবং তার চিন্তাও করেন নি। যদি তারা অপরাধের সাথে শাস্তিকে মিলিয়ে দেখতেন এবং উভয়টার প্রতি সমানভাবে নজর দিতেন তাহলে অবশ্যই তারা অপরাধের সাথে শাস্তির সামঞ্জস্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত দেখে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি একজন চোরের কর্মধারা বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখতে পাই, রাতের আঁধারে সে চুপিসারে বেরিয়ে যাচ্ছে, যে বাড়িতে চুরি করবে তার প্রাচীর গাত্রে সিঁধ কাটছে, ঘরের তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করছে, অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুমমত বাসিন্দাদের ভীত সন্ত্রস্ত করছে, বাড়ির ঐতিহ্য ধ্বংস করে ফেলছে। কেউ মোকাবেলায় আসলে তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা যদি সে ঘরের নারীর কথা চিন্তা করি তাহলে দেখবো মূহুর্তের মধ্যে তার নিদ্রা ভেঙ্গে গেছে, চোখ খুলতেই দেখতে পায় সামনে এক ভয়াল মূর্তি অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরূপ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যায় আতংক ও অস্থিরতার ঝড়। ঘরের শিশু-কিশোরদের কথা যদি ভাবি, তাহলে দেখবো, মায়ের চিৎকারে তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ঘরের মধ্যে বিভৎস ভীতিকর অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁপছে। তারা দেখছে, চোরের চক্ষুদ্বয় থেকে ক্রোধের আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে সাথে তাদের ওপর সে নির্যাতন চালাচ্ছে বা প্রতিহত করছে।

আমরা আরও দেখতে পাই, কোথাও চুরির ঘটনা ঘটলে সেখানকার সকল মানুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ভয়ে সংকুচিত হয়ে যায়। কেননা চোরের লিপ্সা অর্থ ও মাল আহরণ করা। এরূপ অর্থ ও মাল তাদের সবার কাছেই মজুদ আছে। তাই নিরূপায় হয়ে তারা সহজ শিকারে পরিণত হয়ে। চোরের কর্মকাণ্ড যে অবস্থার সৃষ্টি করল সেগুলো বা তার কিছু অংশ নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি এবং একই সাথে তার পাপিষ্ট হাত কর্তনকে মিলিয়ে দেখি তাহলে কিছুতেই বলা যাবে না যে, তার শাস্তি যুলুম ও অবিচার মূলক হয়েছে কিংবা বলা যাবে না যে, কষ্ট-যাতনার সাথে অপরাধের সামঞ্জস্যতা নেই। ইসলামী শরী'আতের অন্যান্য শাস্তির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের উচিৎ এসব অপরাধ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা মুক্ত কোনো মন্তব্য করার পূর্বে অপরাধীর অপরাধ এবং তার মধ্যে যে সব বাড়াবাড়ি, অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতির দিক আছে সেগুলোকে সামনে আনা। এ ধরণের মন্তব্য যেমন সঠিক হয় না তেমন অপরাধের সামগ্রিক দিক পরিবেষ্টনও করে না।

প্রতিটি শাস্তির ওপর বিশেষ বিশেষ আপত্তি

৪৫. ইসলামের সামগ্রিক শাস্তি বিধানের ওপর সাধারণ আপত্তির পর অভিযোগকারীগণ প্রতিটি শাস্তি সম্পর্কে পৃথক পৃথক আপত্তি তুলেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম আপত্তি

৪৬. ব্যভিচারীর বেত্রাঘাত, নির্বাসন ও রজম এবং অপবাদকারীর বেত্রাঘাত -এ জাতীয় শারীরিক শাস্তির মধ্যে অপরাধীর মানবিক সত্তাকে হরণ করা হয়, যা আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কোনো নারীর

সম্মতিতে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তবে এটা তার ব্যক্তি স্বাধীনতার আওতাভুক্ত, যা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। এ স্বাধীনতা যে ভোগ করে তাকে বেত্রাঘাত করা যায় না।

৪৭. এ অভিযোগ খণ্ডণ করা অতি সহজ। কেননা ব্যভিচারী তার কুকর্ম দ্বারা নিজেকে কলঙ্কিত করেছে, গৌরবান্বিত করে নি। নিজেকে কলুষিত করার উদ্যোগ নিয়েছে, রক্ষা করার পদক্ষেপ নেয় নি। যে ব্যভিচারী অন্যের পাত্রের পানি পান করতে আসক্ত হয়, কোনো উপদেশ ধমক তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবে না, তাকে বিরত রাখতে পারবে চাবুকের আঘাত ও শারীরিক নির্যাতন। অন্তরের অনুভবে কাজ হবে না, লাগবে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। আর নির্বাসনে দেওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে অপরাধের স্থান ও এলাকা থেকে দূরে অবস্থান করলে ধীরে ধীরে লোকের অন্তর থেকে সে বিস্মৃত হবে। নিজেকে নিয়ে একান্তে ভাববার সুযোগ পাবে। নিজের কৃত অপরাধের জন্য নিভৃতে থেকে চিন্তা ও অনুশোচনা করতে পারবে, যা তাকে আত্মসংশোধনের দিকে এগিয়ে নেবে। এরপর থাকে বিবাহিত ব্যভিচারীর রজম বা প্রস্তর আঘাতে হত্যা করা প্রসঙ্গ। এর কারণ হচ্ছে, অবৈধ উপভোগের নেশায় এই ব্যভিচারী পাপ ও অনাচারের সকল সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। অন্যের পানির ঘাটে অবগাহন করতে প্রলুব্ধ হয়েছে। অথচ এই কামনা পূরণ করার মতো এমন ব্যবস্থা তার নিকট বর্তমান আছে যা তাকে এহেন অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এ অবস্থায় সমাজ দেহ থেকে এ ক্ষত অঙ্গটি কেটে ফেলা ও মাটিতে পুঁতে দেওয়া জরুরী, যাতে সমাজের বুকে পাপ ও অনাচারের উৎস অবশিষ্ট না থাকে এবং সমাজের সবাই তার এ ফাসাদ থেকে মুক্তি পায়। এছাড়া তার অন্যায়-অপরাধের কারণে সবাই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সমাজ থেকে

তাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনুশোচনা করার কোনো কারণ নেই। যেমন মানব দেহে সৃষ্ট ক্ষত কেটে ফেললে কোনো দুঃখ-অনুশোচনা হয় না যদি আশংকা থাকে যে, ঐ ক্ষত অবশিষ্ট দেহে ক্রম-বিস্তার ঘটাবে।

তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়ে বলেন, ব্যভিচারীর কাজ ব্যক্তি স্বাধীনতারই বহিঃপ্রকাশ। কেননা এটা স্বেচ্ছায় ও উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পন্ন হয়, বাধ্য করে ও বল প্রয়োগ করে হয় না। বস্তুতঃ এ একটি দুর্বল ও ভঙ্গুর যুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা কোনো বন্ধনহীন অবারিত সুযোগের নাম নয়; বরং অন্যের কোনো প্রকার ক্ষতি না হওয়ার শর্তে আবদ্ধ। কিন্তু ব্যভিচারের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক আকারের ক্ষতি। যেমন, বংশের ওপর কলঙ্ক লেপন, বংশধারা খতম করা, যা সমাজের ভিত্তি হিসেবে গণ্য, বংশ পরিচয়ে সন্দেহ সৃষ্টি, শিশু ধ্বংস, নারী ও স্ত্রীদের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি, বিবাহে অনীহা, নানা প্রকার জটিল রোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। তাই সমাজের অধিকার আছে ব্যভিচারীর এসব ক্ষতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। ব্যভিচারী তার সাময়িক আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে সমাজের এতসব ক্ষতি সাধন করে। অথচ বিবাহের মাধ্যমে বৈধ পন্থায় সে তার কামনা চরিতার্থ করতে পারে। বিবাহে অসামর্থ থাকা কিংবা বিবাহ করতে বিলম্ব হওয়ায় তার জন্য ব্যভিচার করা বৈধ হয়ে যায় না। সে যেহেতু সমাজের একজন সদস্য, তাই তাকে এমন স্বচ্ছ পথে চলতে হবে যাতে সমাজের কারো কোনো ক্ষতি না হয়। তাকে বেছে নিতে হবে জীবন যাপনের পবিত্র পথ এবং এ পথে চলার কিছু কষ্ট-ক্লেশ বরণ করতে হবে নিজের ও সমাজের স্বার্থে। শেষ কথা হলো, দুজনের সম্মতিক্রমে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হলেই তা বৈধ হয়ে যায় না এবং তার ফলে সৃষ্ট সমাজের অনিবার্য ক্ষতিও দূর হয় না। এছাড়া ইজ্জত-মর্যাদার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ চলে না,

ক্ষতিপূরণ হয় সম্পদের ক্ষেত্রে। এ পর্যন্ত যা বলা হলো, এরপরে কোনো সুবিবেচক কি বলতে পারবেন যে, মানুষকে বন্ধনমুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হোক আর তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে পরস্পর ব্যভিচার চর্চা করুক? তাদেরকে শাস্তি দেওয়া দূরে থাক এ কাজ থেকে বারণও করা যাবে না?

৪৮. এরপর অপবাদকারীর বেত্রাঘাত প্রসঙ্গ। অভিযোগ করা হয় যে, বেত্রাঘাতের দ্বারা অপরাধীর মানবাধিকার লংঘন করা হয়। তাদের এ অভিযোগও অগ্রহণযোগ্য-প্রত্যাখ্যাত। কেননা অপবাদকারী অন্যের ওপর অশ্লীলতার মিথ্যা দোষারোপ করে কুৎসা রটিয়েছে। এখন তাকে দোষমুক্ত করার জন্য অপবাদকারীর মিথ্যাকে জনসম্মুখে প্রকাশ করা ও প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের মাধ্যমে মিথ্যার ওপর প্রমাণ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সুতরাং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে একজনের সম্মানহানি করে সে নিজেকে বেত্রাঘাতের সম্মুখীন করেছে এবং নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে।

৪৯. ব্যভিচারী ও অপবাদকারীর শাস্তির মূলতত্ত্ব: ইসলাম মানব সমাজের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইজ্জত-সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং সদগুণাবলী বিকাশের প্রতি যত্নবান। এ বিষয়গুলো যখন কাঙ্খিত ও সমাদৃত এবং এর লালন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা জরুরী, তখন স্বাভাবিকভাবেই একে প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায় ও মাধ্যমও হবে কাঙ্খিত ও অপরিহার্য। শরী'আত এ কথাই বলে। পক্ষান্তরে এগুলো যখন কাঙ্খিত ও আকর্ষণীয় থাকে না তখন একে প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায় ও মাধ্যমও গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যারা এসব শাস্তির ওপর আপত্তি তোলেন তাদের আপত্তির মূল কারণ এ তত্ত্বের মধ্যে নিহিত। ইসলামী শরী'আত চায় সমাজের পবিত্রতা ও কলুষমুক্ত

পরিবেশ। সেই লক্ষে শরী'আতে ব্যভিচার ও অপবাদের শাস্তি বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। কেননা এ শাস্তির মাধ্যমে সমাজের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে। অভিযোগকারীগণ সামাজিক পবিত্রতার পরোয়া করে না বা যথাযথ গুরুত্ব দেয় না অথবা তাদের আপত্তির মধ্যেই যে সামাজিক পবিত্রতা না চাওয়ার প্রমাণ নিহিত তা তারা উপলব্ধি করে না। আর সে কারণে তারা এসব আপত্তি উত্থাপন করেন।

দ্বিতীয় আপত্তি

৫০. এ আপত্তি চুরি ও ডাকাতির শাস্তি প্রসঙ্গে। এ শাস্তির মধ্যে আছে হাত ও পা কর্তন, হত্যা ও শূলে চড়ানো। আপত্তিকারীগণ বলেন, অঙ্গচ্ছেদের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া একটি প্রাচীন পদ্ধতি। সে যুগ এখন শেষ এবং সে জীবন প্রণালীও অতীতের গর্ভে বিলীন। যে আধুনিক যুগে আমরা বাস করছি তার চাহিদার সাথে এ শাস্তি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ জাতীয় শাস্তি সমাজের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা এর দ্বারা অপরাধী ব্যক্তি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এর পরিবর্তে তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখাই উত্তম। যেখানে তার প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকবে।

৫১. এ আপত্তি অগ্রাহ্য। কারণ, এ পদ্ধতি প্রাচীন -শুধু এ কারণে তাকে মন্দ ও পরিত্যক্ত বলা যায় না। কেননা সকল প্রাচীন যেমন পরিত্যাজ্য নয়, তেমন সকল আধুনিকও গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া আধুনিক আইনে শিরচ্ছেদ করার বৈধতা আছে। আর শির হাতের তুলনায় অধিক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। বড় অঙ্গ যখন কর্তন করা যায় তখন ছোট অঙ্গ কর্তন করা যাবে না কেন? পার্থিব জীবন থেকে দেহ সত্ত্বাকে কর্তন করে ফেলা যখন বৈধ তখন এই দেহের একটা অংশ কর্তন করা বৈধ হবে না কেন?

অভিযোগে বলা হয়েছে, যার হাত কাটা হয় সে সমাজের বোঝা হয়ে যায়। এ কথাটা যেমন সত্য তেমন এ কথাও সত্য যে, হাত কাটা ব্যক্তি সমাজের বোঝা হলেও সমাজে তার অপরাধ করাও বন্ধ হয়ে যায়। হাত বহাল রেখে নিকৃষ্ট হারাম উপার্জনের মতো জঘন্য অপরাধ করার চেয়ে হাত কাটা অবস্থা তার জন্য ও সমাজের জন্য কল্যাণকর।

এরপর থাকে হাত কর্তনের পরিবর্তে তাকে সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য জেলখানায় বন্দী করে রাখা প্রসংঙ্গ। এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, জেলখানায় চোরের অবস্থান, বিভিন্ন অপরাধীদের সাথে অবাধ মেলামেশা ও সরকারী অপ্যায়নের সুযোগে সে আরো বড় চোর হয়ে বেরিয়ে আসে। তাই দেখা যায় জেলখানায় গেলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া চুরির বদ অভ্যাস কারো বদলায় না; বরং চোরদের জন্য জেলখানা হয়ে যায় এক নিরাপদ বাসস্থান। সেখানে তারা পরস্পর মিলিত হয়ে চুরিসহ অপরাধ জগতের বিভিন্ন সংবাদ আদান প্রদান করে। অন্য দিকে হাত কর্তনের বদৌলতে সমাজ থেকে চুরির প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায় অথবা অন্ততঃ ব্যাপকতা হ্রাস পায়। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস আমাদের এ দাবীর স্বপক্ষে জ্বলন্ত সাক্ষী। তখন সমাজের মানুষের নিকট এ শাস্তি বিরাট সুফল বয়ে এনেছিল। যতদিন এ শাস্তি কার্যকর ছিল ততদিন তারা চুরি ও চোরের উপদ্রব থেকে নিরাপদ জীবন লাভ করেছে। এ শাস্তি যখন বিদায় নিল ও কার্যকারিতার পথ রূদ্ধ হলো, তখন পুনরায় চোরের সংখ্যা অধিক হারে বেড়ে গেল এবং চৌর্যবৃত্তির দ্রুত বিস্তার ঘটল। আর এর থেকে জন্ম নিল যুলুম, হত্যার মতো বড় অপরাধ। সুতরাং এ শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মানব গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর। অতীতে যেমন চুরি দমন করতে এ বিধান সক্ষম হয়েছিল বর্তমানেও দমন করতে তদ্রূপ সক্ষম।

মদ পানের শাস্তির ওপর আপত্তি

৫২. অভিযোগকারীদের তৃতীয় আপত্তি মদ্যপানের শাস্তি সম্পর্কে। তারা বলেন মদ্যপান করা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। একজন লোক যেমন কমলার রস পান করতে পারে তেমন আঙ্গুরের রসে তৈরি মদ পান করার অধিকারও তার আছে, যদিও তা নেশা সৃষ্টি করে। এ অধিকার ভোগ করা থেকে তাকে নিষেধ করা এবং নিষেধ না শুনলে তাকে শাস্তি দেওয়া এবং সে শাস্তি বেত্রাঘাতের দ্বারা হওয়া -সবই ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার শামিল এবং মানবতার বিরুদ্ধে অহেতুক-অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি।

৫৩. এ হলো তাদের বক্তব্য। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন যে, ইসলামী শরী'আত মানুষের সামগ্রিক সুস্থ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং যে জিনিসে তার ক্ষতি হয় তা থেকে নিবৃত রাখে, যদিও সে ঐ ক্ষতি স্বেচ্ছায় নিজের ওপর বরণ করে নেয়। কারণ, তার এ ক্ষতির প্রভাব গোটা সমাজের ওপর পতিত হয়। নেশাপানে মানুষের যত ক্ষতি হয় তন্মধ্যে একটি ক্ষতি হলো -এর দ্বারা জ্ঞান নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জ্ঞান অতি মূল্যবান একটি জওহর (মৌলিক উপাদান) যা আল্লাহ মানুষের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন নেশাপানের পথ থেকে ফিরে থাকার জন্য। ঘুমের মধ্যে মানুষের জ্ঞান নিষ্ক্রিয় থাকে। বিশ্রামের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এরপর নেশাপান করে জ্ঞান ও দেহকে নিষ্ক্রিয় রাখার কি কোনো প্রয়োজন আছে? তাছাড়া মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্তের সামনে অপরাধের বিভিন্ন পথ সুগম হয়ে যায়, অর্থের অপচয় হয়, পরিবারবর্গের প্রতি অসৌজন্য আচরণ করা হয় এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা দেখা দেয়। নেশা পরিহার করতে শরী'আতের পক্ষে এ ক্ষতিগুলো কি কারণ হিসেবে যথেষ্ট নয়? মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা প্রণীত হয়েছে নেশাকারীকে সুপথে ফিরিয়ে

আনতে ও অপর মানুষের কল্যাণ কামনার্থে। এখন যদি এর সাথে কোনো শাস্তির সংশ্লিষ্টতা না থাকে তাহলে এই নিষেধাজ্ঞার কি মূল্য আছে?

এরপর থাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণের বিষয়। এর কারণ এই যে, সু-পরামর্শ যখন ব্যর্থ হয় ও উপদেশ যখন বিফলে যায় এবং নেশার ঘোরে নিজের ওপর ক্ষতি টেনে আনতে দেখা যায় তখন তাকে ভালো করতে ও আলোর পথে আনতে যন্ত্রণা ও বেদনাদায়ক কোনো ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এ উদ্দেশ্যেই বেত্রাঘাতকে শাস্তিরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অবশেষে বলতে হয়, ব্যক্তি স্বাধীনতার ধুঁয়া তুলে মানুষকে খেল তামাশায় নিমগ্ন রাখা এবং তাকে নিজের ও অন্যের ক্ষতি করতে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার দাবী করাটা নিতান্তই শিশুসুলভ কথা, যাদেরকে আগুন নিয়ে খেলতে বা ক্ষতিকর কিছু হাতে নিতে দেখে নিষেধ করা হলে চিৎকার ও হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। বলুন, এই পথ উত্তম, না শাস্তি দিয়ে তাদেরকে ঐ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা উত্তম?

মুরতাদের শাস্তির ওপর আপত্তি

৫৪. অভিযোগকারীগণ বলেন, মুরতাদের শাস্তি একজন মানুষের স্বাধীন আকীদাহ-বিশ্বাসের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ, ধর্ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জবরদস্তি এবং যে ধর্ম সে মানতে অনিচ্ছুক ও অনাগ্রহী তা বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে বাধ্য করার নামান্তর।

৫৫. এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। মূলতঃ মুরতাদের শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং রিদ্দা শব্দের তাৎপর্য ও আকীদাহ পরিবর্তনে জবরদস্তি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ আপত্তির কারণ। এর বিবরণ নিম্নরূপ:

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রিদ্দা অর্থ ইসলাম ত্যাগ করা। আর ইসলাম যে ত্যাগ করে তাকে বলা হয় মুরতাদ। এখন আমাদের সামনে এমন একজন মুসলিম উপস্থিত যে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে অপরাধী। এ মাসআলার সুরাহা কী? আমরা তো ইয়াহুদী বা নাসারা ধর্মের ইমাম নই যে, ইসলাম ত্যাগ করে সে নতুন যে ধর্মে প্রবেশ করেছে জোরপূর্বক সে ধর্ম পরিবর্তন করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করব। উল্লেখ্য যে, ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। সে বর্ণনাই ইসলামী বিধানে এতদসংক্রান্ত মূলনীতি। এ নীতি এতই সহজ-সরল ও স্পষ্ট যে, এর সাথে অন্য কিছু যোগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি জিযিয়া কর প্রবর্তণ ও জিম্মী চুক্তির ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসসহ স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা ও ইসলাম গ্রহণ করতে বল প্রয়োগ করা যদি বৈধ হত তাহলে ইসলাম কখনও জিম্মী চুক্তির বিধান দিত না।

তবে এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুরতাদকে তা হলে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? এটা কি তার না রাজী সত্ত্বেও তাকে ইসলামে বহাল রাখার জন্য বাধ্য করা হয় না? এ প্রশ্নের জবাব এই -একজন মুসলিম তার ইসলাম পরিচয়ের মাধ্যমে ইসলামী বিধি-বিধান ও ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাস স্বীকার করে নেয়। স্বীকার করে নেওয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যায় না। স্বীকার করে যে প্রত্যাহার করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। মুরতাদ ইসলামকে স্বীকার করে তা প্রত্যাখ্যান করায় এবং এর সাথে আরো কিছু অবস্থা মুক্ত হওয়ায় তার জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ মুরতাদ ইসলাম ত্যাগ করার ফলে আরও বেশ কিছু অপরাধে জড়িয়ে পড়ে অথবা বলা যায় এ

অপরাধগুলো তার মুরতাদ হওয়ার অনিবার্য পরিণতি। তাহলো, মুরতাদকে অবশ্যই প্রকাশ্যেভাবে তার ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিতে হয়। ঘোষণা দেওয়ার যেসব পদ্ধতি চালু থাকে তন্মধ্যে যে কোনো এক পদ্ধতিতে ঘোষণা দেবে। কেননা সে যদি তার ধর্ম পরিবর্তনকে গোপন রাখে, ঘোষণা না দেয় তাহলে আমরা তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব না। ফলে সে মুনাফিক হয়ে থাকবে। সুতরাং তার ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা করাটাই আর এক অপরাধ। কেননা এর দ্বারা মুসলিম উম্মার আকীদাহকে হেয় করা হয় ও ইসলামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া তার ইসলাম ত্যাগে মুনাফিকদের কপটতা বেড়ে যায়, সর্বত্র ইসলাম বর্জনের চর্চা হতে থাকে ও মুনাফিকদের কপটতা প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। তদুপরি তাদের আকীদাহর সাথে দুর্বল আকীদাহর সংমিশ্রণে সমাজে সংশয় সন্দেহ দানা বেধে ওঠে। এ বিষয়গুলো সমাজের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্থির করে তোলে ও এ ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যেহেতু এগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়, তাই মুরতাদকে শাস্তি দানের মাধ্যমে সমাজ থেকে এসব নির্মূল করা অপরিহার্য। মুরতাদের শাস্তি রাখা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। কেননা তার অপরাধ গুরুতর। আর দায়িত্বে অবহেলা করে সে অপরাধকে আরো ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। তার এ শাস্তিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে অবহেলাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সরকারের সাথে সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহের চুক্তি করে। সৈনিকরা আছে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি চুক্তিকারী খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, অথচ চুক্তি অনুযায়ী খাদ্য পাঠাতে কোনো সমস্যা নেই। এ অপরাধে তার শাস্তি

মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত থেকে পারে। অনুরূপ কোনো ধাত্রী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করবার চুক্তি করে, এরপর চুক্তি ভঙ্গ করে দুধ পান করানো বন্ধ করে দেয় এবং ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি মারা যায়, তাহলে একদল ফকীহর মতে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

উপসংহার, মুরতাদের অপরাধ গুরুতর হওয়া সত্বেও ইসলামী শরী'আত তাকে তিন দিন অবকাশ দেওয়ার কথা বলেছে। এর মধ্যে সে যদি ফিরে আসে তবে তার শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের পর কারো পক্ষে একথা বলার কি কোনো সুযোগ আছে যে, মুরতাদের শাস্তি তার স্বাধীন বিশ্বাসের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং তাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার নামান্তর?

হুদূদের বিকল্প শাস্তি হয় কিনা?

৫৬. শরী'আতের হুদুদ ব্যবস্থা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা (نص) থেকে গৃহীত। এটা বদলায় না, রহিতও হয় না। রহিত হওয়ার জন্য রহিতকারী থাকতে হয়; কিন্তু ইসলাম আসার পর অহী ও রাসূল আগমনের পথ রুদ্ধ। সুতরাং এ শাস্তি রহিত করা বা বদলানোর সাধ্য কারও নেই। অনুরূপ ইজতিহাদের দ্বারা একে স্থগিত রাখা বা পরিবর্তন করাও যাবে না। কারণ, শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি আল্লাহ ও রাসূলের স্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে কোনো ইজতিহাদ চলে না (لا اجتهاد في معرض النص)। তাই হুদুদ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা নেই। বাস্তবায়ন করতে বিরত থাকার অর্থ শরী'আতের অবাধ্য হওয়া। মুসলিমদেরকে এ পথ পরিহার করা এবং অবাধ্যতায় স্থায়ী থাকার নীতি ত্যাগ করা উচিত। এ পথেই সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা উৎখাত হবে অথবা অন্তত: বহুলাংশে

কমে যাবে এবং মানুষ অনাবিল শান্তি, নিরাপত্তা ও পবিত্র জীবন-যাপনের সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: কিসাস ও দিয়াত

৫৭. হত্যা, যখম ও অঙ্গচ্ছেদ -এ অপরাধগুলো কেউ ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিতভাবে ঘটালে তার শাস্তি হয় কিসাস (অপরাধী যা করেছে তাই করে তাকে শাস্তি দেওয়া)। স্বয়ং বিধানদাতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ শাস্তি নির্ধারিত। কিসাসের হকদার আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারীগণ। পক্ষান্তরে এ অপরাধগুলো যদি কারো দ্বারা ভ্রম বসত হয় অথবা ইচ্ছাকৃত হয় কিন্তু কিসাসের সকল শর্ত পূরণ না থাকে তখন শাস্তি হয় দিয়ত বা রক্তমূল্য। দিয়তও শরী'আত কতৃক নির্ধারিত শাস্তি। আর মানুষের অঙ্গ কর্তন বা যখমের ক্ষেত্রে ধার্য শাস্তিকে বলে (ارش) আরশ। এখানে দিয়ত না বলার কারণ হলো, দিয়ত শব্দটি পূর্ণ দিয়তের (الدية الكاملة) জন্য ব্যবহৃত হয় যা কেবল প্রাণ বধের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। তবে কোনো কোনো ফকীহ দিয়ত শব্দকে প্রাণবধ ছাড়াও যখম ও অঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন। এটা তাদের নিজস্ব পরিভাষা মাত্র। আর পরিভাষার মধ্যে কোনো আপত্তি থাকে না।

৫৮. কিসাস সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অপরাধীর সাথে ঠিক সেরূপ আচরণ করা যেরূপ আচরণ সে করেছে। আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর কিসাস যেহেতু বান্দার অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারীদের অধিকার তখন তাদের অধিকার আছে দিয়ত বা রক্তমূল্য নিতে সম্মত হয়ে কিসাস মাফ করে দেওয়া অথবা কিসাস ও দিয়ত উভয়টা মাফ করে দেওয়া। যখন তারা মাফ করে দিবে তখন আদালত তা'যীর হিসেবে অপরাধীকে শাস্তি

দিতে পারবে।

৫৯. উল্লিখিত অপরাধসমূহ যদি ভুলক্রমে সংঘটিত হয় তাহলে ইমাম শাফেঈর মতে দিয়ত আদায় করবে অপরাধীর স্বজনরা (عاقلة)। তিনি ব্যতীত অন্যান্য ফকীহদের মতে দিয়তের কত অংশ অপরাধী বহন করবে এবং কত অংশ তার স্বজনরা বহন করবে সে ব্যপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আকিলা বা স্বজন হলো হত্যাকারীর আসাবা অর্থাৎ নিকটাত্মীয় পুরুষ, যারা অপরাধীর পিতৃ-বংশের সাথে যুক্ত, যদিও তাদের সম্বন্ধসূত্র দূরবর্তী হয়।

কিসাস ও দিয়ত শাস্তির গুরুত্ব

কিসাস শাস্তির মধ্যে অপরাধের মূলনীতি -সুবিচার, সমতা, নিবৃত রাখা ও সমাধান করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তাই কিসাস প্রয়োগের দ্বারা শাস্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য এবং নাগরিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এ শাস্তির মধ্যে সমতা ও সুবিচারের দৃশ্য এতই স্পষ্ট যে, কারো কাছে তা গোপন থাকা অসম্ভব। কেননা অপরাধীর সাথে কেবল সে আচরণই করা হয় যে আচরণ সে করেছে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর। এ কারণে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি সাদৃশ্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায় এবং সমতার সাথে অনুরূপ আচরণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে কিসাস রহিত হয়ে যায়। যেসব লোক মানুষের প্রাণ সংহারের সংকল্প করে এ ব্যবস্থা তাদেরকে কিসাসের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দমিয়ে রাখে। তা ছাড়া কিসাস যেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হক, সুতরাং কিসাসের হাত থেকে হত্যাকারীকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। অনুরূপ এ শাস্তি কার্যকর থাকলে অপরাধের বিভিন্ন পথও রুদ্ধ থাকে। কেননা নিহতের উত্তরাধিকারীগণ যেহেতু কিসাস

নেওয়ার অধিকারী তাই তারা অন্যভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না, নিরপরাধীকে হত্যা করবে না কিংবা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নিজেরাই অপরাধীকে হত্যা করবে না।

অভিযোগ ও তার জবাব

৬১. এক শ্রেণির লোক ইসলামের দণ্ডবিধান -কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যা (القصاص في النفس) সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাদের অভিযোগ দু'টি।

এক. কিসাস একটি নির্মম নিষ্ঠুর শাস্তি। কেননা সকল হত্যার ক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখা হয় না।

দুই. এ বিধানে কিসাসকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের অধিকার বলা হয়েছে অথচ হত্যাকাণ্ডকে সমাজের প্রতি মারাত্মক হুমকি ও ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং কিসাস সমাজের অধিকার, উত্তরাধিকারীদের নয়।

প্রথম অভিযোগের জবাব: কিসাস আদৌ নিষ্ঠুর বিধান নয়। কেননা অপরাধী একজনকে হত্যা করেছে। তার বদলা হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। সে অন্যের ওপর যা করেছে তার চেয়ে বেশি কিছু তার ওপর করা হয় না। আর অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করার বিষয়ে আমরা বলছি যে, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব যতটুকু বিবেচনা করা প্রয়োজন শরী'আত ততটুকু করেছে। সে হিসেবে অপরাধী যদি বালেগ, বিবেকবান ও স্বাধীন হয় তখন সে কিসাসের যোগ্য হয়, যদি সে অন্যায়ভাবে ইচ্ছাপূর্বক কাউকে হত্যা করে। তার বালেগ হওয়া, বিবেকবান হওয়া ও স্বাধীন হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেই তার প্রতি বিবেচনা করার দাবী শেষ হয়ে যায়। এই সীমানা পেরিয়ে তার মর্যাদা, অনুরাগ ও আভিজাত্য বিবেচনায় আনা হলে আমরা

খেয়াল-খুশির চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত হব, সামাজিক বিধান ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, অপরাধী শাস্তি থেকে খালাস পেয়ে যাবে এবং অন্যরা এ অপরাধ করতে আশকারা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে মানব সমাজের জন্য বড় ধরণের ক্ষতি, যা থেকে রক্ষা পেতে শরী'আতের কিসাস প্রয়োগ অপরিহার্য।

দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব: কিসাসকে নিথেকের উত্তরাধিকারীদের অধিকার গণ্য করা এবং সমাজের অধিকার গণ্য না করা এ বিধানের দোষ নয়; বরং অন্যতম সৌন্দর্য। কেননা অপরাধের প্রত্যক্ষ শিকার হয় নিহত ব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারীগণ। স্বজন হারাবার দহন জ্বালা তাদেরকেই সহ্য করতে হয়। পক্ষান্তরে সমাজের যে ক্ষতি হয় তা হয় পরোক্ষভাবে। তাই ইসলামের দাবী হলো তাদের হৃদয় থেকে ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করা এবং কিসাসের অধিকার প্রদান করা। এরপর যদি তারা চায় তাহলে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং সেটাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। তারপর তারা কিসাস গ্রহণ করুক বা ক্ষমা করে দিক উভয় অবস্থায় অপরাধ প্রবণতা থেমে যাবে, অগ্রসর হবে না। অপরাধ নির্মূল হবে, ছাড়া পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিহতের উত্তরাধিকারীগণ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও আদালতের ইখতিয়ার আছে তাকে তা'যীর দণ্ড প্রদান করা।

আরও একটি অভযোগ ও তার জবাব

৬২. অভিযোগ করা হয় যে, হত্যা ব্যতীত যখম ও অঙ্গ কর্তন করার অপরাধে কিসাস (القصاص فيما دون النفس) হিসেবে অপরাধীকে অনুরূপ যখম করা ও অঙ্গ কর্তন করার শাস্তি একটি নির্দয় ও কঠোর শাস্তি। এ অভিযোগ পূববর্তী অভিযোগের মতোই প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা হত্যার কিসাস এবং যখম বা অঙ্গ কর্তনের উদ্দেশ্য একই। তা হলো অপরাধ দমন,

সতর্ককরণ এবং ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা। যখম বা অঙ্গ কর্তনের ফলে কোনো কোনো সময় আহত ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটে থাকে। তাই হত্যার ক্ষেত্রে যেমন কিসাস ওয়াজিব তেমনি যখম ও অঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রেও কিসাস ওয়াজিব। জীবনের ওপর যুলুম করায় শিরচ্ছেদ যখন বৈধ তখন একটি অঙ্গ কর্তন করা তো আরো বেশি বৈধ।

দিয়তের ওপর অভিযোগ ও তার জবাব

৬৩. শরী'আতের অন্যতম বিধান দিয়ত সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। তারা বলেন, দিয়তের ভার বহন করতে হয় স্বজনদের, অথচ তারা অপরাধের সাথে জড়িত নয়। এটা শাস্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবির পরিপন্থী। অভিযোগের জবাব, স্বজনরা কেন দিয়তের ভার বহন করবে তার কারণ ইতোপূর্বে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ঐ বর্ণনার সারকথা হলো, স্বজনদের ওপর দিয়ত আরোপ শাস্তি হিসেবে হয় নি, হয়েছে সহযোগিতা ও সহমর্মীতা হিসাবে। কোনো কোনো অবস্থায় সহমর্মীতা দেখানো অপরিহার্য করে দেওয়ার পূর্ণ অধিকার শরী'আতের আছে। যেমন, অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক সাহায্য ও ভরণপোষণ দেওয়া শরী'আত অপরিহার্য করে দিয়েছে। এছাড়া স্বজনদের ওপর দিয়ত আরোপের আরও কারণ হলো - অপরাধীকে দেখাশুনা করা, সুশিক্ষা দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব স্বজনদের। তারা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেছে। সে ত্রুটির জন্য তাদের ওপর দিয়ত আরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশদভাবে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: তা'যীর শাস্তি

৬৪. তা'যীর (التعزير) এর আভিধানিক অর্থ শিক্ষামূলক শাস্তি (التأديب) শরী'আতের পরিভাষায় সেসব অন্যায় ও পাপ কর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াকে তা'যীর বলে যে ব্যপারে নির্ধারিত শাস্তি নেই।[19] যেসব অপরাধে তা'যীর ওয়াজিব হয় সেগুলো হচ্ছে শরী'আত কতৃক ঐসব নিষিদ্ধ কাজ যার জন্য ইসলামী শরী'আতের পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই। যেমন, বেগানা মহিলার সাথে একান্তে থাকা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, আমানতের খিয়ানত করা, মৃত প্রাণি ভক্ষণ করা, ব্যাভিচার বাদে অন্য কোনো বিষয়ে অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ঘুষ খাওয়া ও অন্যান্য যেসব কাজ শরী'আত হারাম করেছে তা করা কিংবা শরী'আত যা অবশ্য পালনীয় করেছে তা ত্যাগ করা।

তা'যীরের প্রকারভেদ

৬৫. কষ্ট ও পীড়াদায়ক যে কোনো কথা, কাজ অথবা বর্জনের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি হয়ে থাকে। কাউকে উপদেশ দিয়ে, কাউকে সতর্ক করে এবং কারো বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। কোনো কোনো অপরাধী তওবা না করা পর্যন্ত কিংবা অপরাধ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সাথে সালাম-কালাম বন্ধ ও সংশ্রব বর্জন করে তা'যীর দণ্ড দেওয়া হয়। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে তিন ব্যক্তির সাথে এরূপ আচরণ করেন পেশাগত দায়িত্ব বা চাকুরি থেকে অপসারণের মাধ্যমেও তা'যীর শাস্তি

---

19 আল আহকামুস সুলতানিয়াহ লি ইবন ইয়া'লা আলহাম্বালী; তাবসিরাতুল হুক্কাম লি ইবন ফারহুন ২য় খণ্ড, পৃ-২৫৮।

দেওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে এ রকম শাস্তি দেওয়ার প্রমাণ আছে। কখনও অপরাধী যে শহরে বাস করে সেখান থেকে অন্য শহরে বহিষ্কার করে কিংবা তার মাথার চুল ন্যাড়া করে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। আবার কখনও প্রহার করে বা চাবুক মেরে বা বন্দী রেখে কিংবা মুখে চুনকালি মাখিয়ে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। কখনও আর্থিক দণ্ডের মাধ্যমে তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যেমন, মদ তৈরির মটকা ও মদ রাখার পাত্র তিনি ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ খায়বর যুদ্ধে গাধার গোস্ত রান্না করার ডেক উপুড় করে গোস্ত ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন। ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করেও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মসজিদে দ্বিরার ভেঙ্গে দেন এবং উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদ বিক্রির দোকান গুড়িয়ে দেন। মাল নষ্ট করার করার দ্বারাও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন, উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বিক্রি করার জন্য পানি মিশ্রিত দুধ রাস্তায় ঢেলে দেন। কখনও সম্পদের একটি অংশ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েও তা'যীর শাস্তি দেওয়া হয়। যেমন, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর অর্ধেক সম্পত্তি তা'যীরের উদ্দেশ্যে সরকার বাজেয়াপ্ত করে থাকে।

তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

৬৬. তা'যীর শাস্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য সর্বোত্তম মতটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তা'যীর নির্ধারণের সময় দেখতে হবে যে, যে জাতীয় অপরাধে তা'যীর দেওয়া হচ্ছে ঐ জাতীয় অপরাধের জন্য শরী'আতে শাস্তির কোনো

পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কিনা। থাকলে তা'যীরের শাস্তি ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত উঠানো যাবে না -তার চেয়ে নিচে রাখতে হবে। তবে ভিন্ন জাতীয় অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির চেয়ে অধিক হলেও কোনো দোষ নেই। যেমন, নিসাবের চেয়ে কম পরিমাণ মাল চুরি করলে তাকে তা'যীর শাস্তি হিসেবে হাত কর্তনের শাস্তি দেওয়া যাবে না। অবশ্য বেত্রাঘাতের তা'যীর দিলে তার পরিমাণ হদ্দে কযফ বা অপবাদ দেওয়ার নির্দিষ্ট শাস্তির পরিমাণের চেয়ে অধিক হলেও কোনো আপত্তি নেই। অনুরূপ ব্যভিচার সংঘটিত না হলে অন্য কুকর্মের জন্য তা'যীর হিসেবে হদ্দে যিনা বা ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া যাবে না। তবে তা'যীর হিসেবে তাকে বেত্রাঘাত দিলে তার পরিমাণ হদ্দে কযফের পরিমাণের চেয়ে বেশিও থেকে পারে।

তা'যীর হিসেবে হত্যা করা

৬৭. হত্যার দ্বারা তা'যীর শাস্তি দেওয়া বৈধ কিনা? ইমাম মালিক (রহ) এর মতে বৈধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর একদল অনুসারী ও ইমাম শাফে'ঈ (রহ) নীতিগতভাবে এ মত সমর্থন করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও আছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতাকারী বিদ'আত প্রথার দিকে আহবানকারীকে হত্যা করার ব্যপারে সবাই একমত। কিন্তু মুসলিম গুপ্তচর হত্যার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক ও কতিপয় হাম্বলী আলমের মতে হত্যা করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফে'ঈর মতে অবৈধ। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে হত্যার দ্বারা তা'যীর শাস্তি দেওয়া জায়েয। এরূপ হত্যা হানাফীগণের নিকট রাজনৈতিক হত্যা (القتل بالسياسة) নামে অভিহিত।[20]

---

20 আসসিয়াসাতুশ শরয়িয়্যাহ লি ইবনি তায়মিয়্যাহ, পৃ-৮৫।

৬৮. তা'যীর শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে হত্যা করা যদি অত্যাবশ্যক হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় না থাকে, এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ বিবেচনা মতে হত্যা করা বৈধ। সুন্নতে নববী থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»

“কেউ যদি তোমাদের একক নেতৃত্বে ফাটল ধরাতে বা দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে তৎপর হয়, তবে তাকে হত্যা কর।”

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যার ফিৎনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাকে হত্যা করা ব্যতীত অন্য কোনো পথ না থাকে তাকে হত্যা করা বৈধ। অপর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যার মদ্যপান করার অভ্যাস কোনো ক্রমেই বন্ধ করা যায় না। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من لم ينته عنها فاقتلوه»

“যে ব্যক্তি এহেন কাজ থেকে বিরত না হয় তাকে হত্যা কর।”

তা'যীর দণ্ড নির্ধারণে বিচারকের ক্ষমতা

আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, তা'যীর দণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতা ব্যাপক। তিনিই তা'যীর পর্যায়ের অপরাধসমূহের

মধ্য থেকে যে কোনো অপরাধের যুক্তিসঙ্গত দণ্ড নির্ধারণ করেন। শরী'আতে তা'যীর জাতীয় যেসব দণ্ডের বর্ণনা দেওয়া আছে -বিচারক তার মধ্যেই ক্ষমতা সীমিত রাখবেন, এর বাইরে যাবেন না। উল্লেখ্য সর্বনিম্ন দণ্ড সতর্ক করা এবং সর্বোচ্চ দণ্ড মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। যে ধরণের দণ্ড তিনি নির্ধারণ করবেন তার পরিমাণও তিনি নির্ধারণ করে দিবেন। যদি বেত্রাঘাতের দণ্ড নির্ধারণ করেন তাহলে বেত্রাঘাতের পরিমাণও ঠিক করে দিবেন। দণ্ড নির্বাচনে ও পরিমাণ নির্ধারণে বিচারক তার প্রবৃত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, আক্রোশ ও প্রতিশোধস্পৃহা এবং যুক্তিহীন ও তড়িঘড়ি করে অদূরদর্শিতার সাথে রায় দিবেন না। দণ্ড নির্বাচনে তিনি নির্ধারিত বিধিবিধানের আলোকে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। যেসব বিধি-বিধান সামনে রেখে তিনি দণ্ড নির্ণয় করবেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - অপরাধের প্রকৃতি, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রভাব, অপরাধীর অবস্থা –সে কি অপরাধের সহযোগী না সংগঠক। তিনি আরও বিবেচনা করবেন -অপরাধের বিস্তৃতি-ব্যাপকতা কেমন এবং তাতে লোকের সংশ্লিষ্টতার পরিমাণ কত এবং কোনো ধরণের দণ্ড অপরাধীকে সংযত রাখতে ও অন্যদেরকে সতর্ক করতে কতটুকু সহায়ক হবে। অপরাধ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক সে অপরাধে জড়িত তবে বিচারক দণ্ডের মাত্রা বাড়িয়ে দিবেন। অপরাধী যদি ভদ্র, সচ্চরিত্রবান হয় এবং জীবনে প্রথমবারই এ অপরাধে জড়িয়ে থাকে তবে তার লঘু দণ্ড হবে, পুনরাবৃত্তিকারীর হবে গুরুদণ্ড এবং এভাবেই অপরাধ করার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে দণ্ডের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মোটকথা তা'যীরমূলক অপরাধে দণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান যুগে তা'যীর ব্যবস্থার গুরুত্ব

সমাজে সংঘটিত অধিকাংশ অপরাধ তা'যীর ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। কেননা হুদূদ, কিসাস ও দিয়াত ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করে দেয় নি। কিন্তু এসব অপরাধ তা'যীরের অপরাধের তুলনায় অনেক কম। শরী'আত তা'যীর শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার তথা বিচারপতিদের ওপর ন্যাস্ত করেছে। তারা শরী'আতের আইন ও মূলনীতির আলোকে সেসব শাস্তি ধার্য করেন যার বিস্তারিত বিবরণ শরী'আতে বিদ্যমান রয়েছে। সন্দেহ নেই, এ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক ও অপরিসীম। যেহেতু এটা সেই সমুদয় অপরাধের সুষ্ঠু মীমাংসা করে যার নির্ধারিত শাস্তি শরী'আতে নেই। সুতরাং শরী'আত বিরোধী যে কাজই হোক তার ওপর তা'যীর অবধারিত। অনুরূপ যেসব কাজ শরী'আতের মাপকাঠিতে সমাজের জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর সেগুলোও তা'যীরের আওতায় আসবে। যদিও এসব ক্ষতিকর কাজের মধ্য থেকে কিছু কিছু কাজ মূলের দিক থেকে মুবাহ বা নির্দোষ, কিন্তু স্থান কাল ভেদে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে ক্ষতির কোনো অস্তিত্ব নেই, ক্ষতি শরী'আতে নিষিদ্ধ (إن الضرر مدفوع في الشريعة ومنهي عنه)। কারণ ক্ষতি যুলুমের অন্তর্ভুক্ত আর যুলুম হারাম। সুতরাং মুবাহ কাজ যখন কোনো কারণবশতঃ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়, তখন শরী'আতে তা নিষিদ্ধ হয় এবং তা বর্জন করা হয় ওয়াজিব। সে কাজ যে করে তাকে তা'যীর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا ضرر ولا ضرار».

"ক্ষতি করাও অপরাধ, ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতি করাও অপরাধ।"

তবে সমাজের ওপর ক্ষতির প্রভাব কতটুকু, তার সাথে সঙ্গতি রেখে তা'যীর

শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তা করতে হবে সুচিন্তিত ও যুলুমমুক্ত মন নিয়ে। কেননা যালিমের যুলুম হারাম । এছাড়া উক্ত কর্মের ক্ষতি নিরূপণ করতে হবে শরী'আতের নিক্তি দিয়ে, কু-প্রবৃত্তি ও কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়।

আল্লাহ সত্য বলেন, সঠিক পথ প্রদর্শণ করেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও উত্তম অভিভাবক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের প্রতি দুরূদ ও সালাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

والله يقول الحق ويهدينا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العلمين-